বেহুলা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বিএ প্রণীত

কলিকাতা, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা

৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর
"বিশ্বকোষ-প্রেস"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসদ্বারা মুদ্রিত

মূল্য ৸৹ বার আনা।
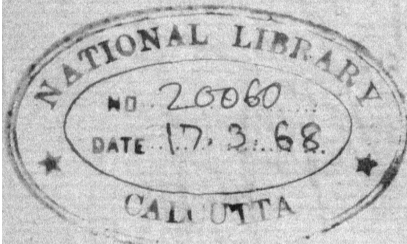
বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পে

মুক্তহস্ত

ও

এদেশবাসীর পরম ভক্তিভাজন

উদার-হৃদয়

লালগোলার স্বনাম ধন্য

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায়বাহাদুরের

কর-কমলে

‘বেহুলার’

এই চিত্র

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

মনসার ভাসান-গান এক সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণের এত প্রিয় ছিল যে, এতদ্দেশের প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভাসান-গানের নায়ক চন্দ্রধরের নিবাসভূমি স্বীয় জন্মস্থানের অদূরবর্ত্তী কল্পনা করিয়া সুখানুভব করিত। বর্দ্ধমানের ষোল ক্রোশ পশ্চিমে একটি চম্পকনগর আছে এবং তন্নিকটে বেহুলা নদীও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মীন্দরের বাসর-গৃহের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে ত্রিপুরা জেলায়ও আর একটি চম্পকনগর আছে। "আসাম-ভ্রমণ" প্রণেতা লিখিয়াছেন, ধুবড়ী অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থানেই চাঁদসদাগরের বাড়ী ছিল। বগুড়ার নিকট মহাস্থান বলিয়া একটা স্থান আছে; অনেকে বলেন, চাঁদসদাগর তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে রণিৎ নদীর তীরে চাঁদসদাগরের নিবাস-ভূমি ছিল বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এদিকে দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্ত-নগরের নিকটবর্ত্তী সনকাগ্রামে চাঁদসদাগরের বাড়ীর

ভগ্নস্তূপ এখনও বিদ্যমান বলিয়া অনেকের ধারণা। মালদহের চাঁপাইনগর ও নেতাধোপানীর ঘাট, বীরভূমে বিপুলার মেলা, চট্টগ্রামের "চাঁদসদাগরের দীঘি ও কালুকামারের ভিটার উল্লেখ আমরা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী-প্রণীত "চন্দ্রধর" কাব্যের ভূমিকায় প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইহা ছাড়া বাঙ্গালার অন্যান্য কতিপয় স্থানেও চাঁদসদাগরের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

যে ঘটনাকে প্রত্যেক বিভাগের লোক আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে এরূপ উৎসুক, তাহার প্রভাব এতদ্দেশের লোকের হৃদয়ে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা কঠিন নহে। বস্তুতঃ মনসার ভাসানগান বাঙ্গলার বহু সাধনার সামগ্রী ছিল। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, বহুলোক সেই সময়ে "দম্ভ করিয়া" বিষহরীর পূজা দিত। বৃন্দাবন-দাসের সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্ত একখানি মনসার ভাসান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভূমি-কায় তিনি লিখিয়াছেন, কাণা হরিদত্তই মনসার গানের আদিকবি। বিজয়গুপ্ত আরও লিখিয়াছেন,

তাঁহার সময়েই উক্ত আদি-কবির গান কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং কাণা হরিদত্ত বিজয়গুপ্তের অন্ততঃ ২ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়। কাণা হরিদত্ত তাহা হইলে ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে গান রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

সম্প্রতি কাণা হরিদত্তের গানের কতকাংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ মনসা-মঙ্গল বাঙ্গালার গৃহে গৃহে গীত হইয়া আসিয়াছে, ভাসানগানে লোকবৃন্দ যে কিরূপ উৎসাহিত হয়, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুমান করা কঠিন ব্যাপার। বরিশাল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রাবণ মাসে নরনারী এই গান শুনিয়া তন্ময় হইয়া যায়—তাহাদের সেই উন্মত্ত আবেগ-দর্শনে স্বতঃই মনে একটা আশ্চর্য্যের ভাব উদয় হয় যে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এই যে একটা মহা-ভাবের আবর্ত্ত চলিয়া যায়—তাহার একটা লহরী পর্য্যন্ত আসিয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কাছে পেঁছে না। স্বদেশের এরূপ পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে

যাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে এবং তাঁহারাই বা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিবেন কি ভরসায় ?

যদি কোন বিষয় অগ্রাহ্য করিতে হয়, তবেও ধীরভাবে তাহার সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখা উচিত। যাহা শত শত বৎসর এ দেশবাসীকে আনন্দ দিয়া আসিয়াছে, সেই উৎসব হঠাৎ একবারে বন্ধ হইয়া গেল কেন ? পল্লীর মুসলমান কৃষকগণ পর্য্যন্ত মনসার ভাসানগানের সমস্ত আখ্যায়িকা পরিজ্ঞাত, অথচ আমরা অনেকে তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না ; ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান উপাখ্যানে আমি সেই প্রাচীন কথা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। একটা দ্রব্যের রস স্বয়ং আস্বাদন করা এক কথা এবং অপরকে তুল্যরূপ রস-ভাগ প্রদান করিতে পারা, আর এক কথা। আমি প্রাচীন পুঁথিতে বেহুলার কাহিনী পড়িয়া সেই স্বামি-বিরহ-বিধুরা, আশ্চর্য্য সাধনা-তৎপরা, একান্তবিপন্না, অথচ নির্ভীকহৃদয়া সাধ্বীর উদ্দেশে নির্জ্জনে কত অশ্রু নিবেদন করিয়াছি

তাহা বলিতে পারি না। বাল্মীকির অঙ্কিত সীতা-চরিত্রের ন্যায় বেহুলার চিত্রও আমার ভক্তির অর্ঘ্যদ্বারা মানসপটে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সেই প্রাচীন কবিগণের সরল উদ্দীপনাও করুণরস উদ্রেক করিবার অসামান্য শক্তির কণিকাও আমার নাই, সুতরাং আমার তুলিতে নমস্য উপাহাস্যরূপে পরিণত না হইয়া থাকি-লেই যথেষ্ট।

মনসার ভাসানে অনেক কথা আছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার সকল বিষয় অবতারিত হয় নাই। চাঁদ-সদাগরের বাণিজ্যসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অনেক পদ্মাপুরাণেই আছে। বেহুলার চিত্র চিত্রণে সেই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিলে বর্ণনীয় কাহিনী অযথা ভারাক্রান্ত হইত। এই ভাবে শঙ্কুর গারুড়ীর মৃত্যু, গুয়াবাড়ী ধ্বংসের বিবরণ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গই ছাড়িয়া দিয়াছি। শঙ্কুর গারুড়ীকে প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে 'ধ্বন্বন্তরী' নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত ইহার নিবাস শঙ্কুর নগরী নির্দ্দেশ করিয়া বহুস্থানে ইঁহাকে শঙ্কুর গারুড়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি প্রাচীন কবির অনুসরণ করিয়া সেই নামই

ব্যবহার করিয়াছি। চাঁদের ভৃত্য "নেড়া"কে কোন কোন কবি "তেড়া" নামে পরিচিত করিয়াছেন। আমি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। গল্পের মধ্যে আমার নিজের কল্পনা অতি সামান্যই প্রয়োগ করিয়াছি।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, শীতলা প্রভৃতি দেবী সম্বন্ধীয় কাব্য পাঠ করিলে দৃষ্ট হয় এই সকল কাব্যের মূল-ভিত্তি শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব। শৈবধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ-মূলক,—জীব এই ধর্ম্মানুসারে পাশমুক্ত হইলেই শিবের সঙ্গে অভেদ হইয়া পড়েন,—শিব নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আনন্দময়; কিন্তু শক্তিবাদীরা দ্বৈতভাব বিশ্বাস করেন এবং যিনি সগুণ, সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ দেবতা এবং জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাঁহারই আশ্রয় ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য-গুলিতে এই প্রভেদ অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শিবভক্তগণ স্বীয় উপাস্যের কোন সহায়তাই লাভ করেন নাই, কিন্তু শক্তি,—চণ্ডী, মনসা, শীতলা বা যে আকারেই পূজিত হইয়াছেন, তিনি স্বীয় ভক্তের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টরূপে কল্পিত হইয়াছেন। অনেকটা অমার্জ্জিত ভাবে কথিত হইলেও পল্লীকবিগণের কাব্য হইতে এই ভাবটাই

উদ্ধার করা যায়। দুঃখের বিষয় চাঁদ সদাগরের চরিত্রের স্থল প্রাচীন কবিগণ ততটা প্রশংসার ভাবে লক্ষ্য করেন নাই, অনেক স্থলেই তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি বিষয়টি অন্য ভাবে দেখিয়াছি, কিন্তু মূলগ্রন্থে যেরূপ পাইয়াছি, আখ্যান ভাগে তাহার বিশেষ অন্যথা-চরণ করি নাই।

দ্বিজ বংশীদাস মনসার ভাসান কাব্যে চণ্ডীকে মনসা দেবীর প্রতিকূলতায় নিযুক্ত করিয়া উপা-খ্যান যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, আমি প্রাচীনতর কবিগণের অনুসরণ করিয়া শেষোক্ত, কবির সেই পন্থা অবলম্বন করি নাই। চাঁদের ডিঙ্গার নাম ও পুত্রগণের নাম আমি বংশীদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছি এবং বেহুলার সাধনার কালে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাও কতকটা রূপান্তরিত করিয়া তাঁহারই কাব্যের আদর্শে রচনা করিয়াছি। অপরাপর বিষয়ে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দই আমার প্রধান আশ্রয় হইয়াছেন। স্থান-নির্দ্দেশসম্বন্ধেও আমি এই কবিদ্বয়কেই অবলম্বন করিয়াছি। যখন বহু স্থানেই চাঁদসদাগরের আবাসভূমি কল্পিত

হইয়াছে, তখন যে কোন প্রাচীন কবিকে অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে। এস্থলে সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনা।

বেহুলা নামটি প্রাচীন পুঁথিতে "বিপুলা"রূপে দৃষ্ট হয়। "সনকা" কোন কোন পুঁথিতে 'শুলকা' রূপে উল্লিখিত, এই "শুলকা" শব্দ "শুক্লা" শব্দের অপভ্রংশ কিনা এবং সনকা সেই অপভ্রংশের রূপান্তর কিনা এ সকল গূঢ়তত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আলোচ্য। গ্রন্থভাগের অপরাপর নাম সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আকার পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয়,—যথা কোন পুঁথিতে "অমলা" কোনটিতে "সুমিত্রা" ইত্যাদি।

হিন্দু গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে যদি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেও সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই আমার চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি, লালগোলার স্বনামধন্য রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ানুকুল্য করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

বেহুলা

(১)

পরম শৈব চাঁদ-সদাগর চম্পক-নগরের অধিপতি ছিলেন। শিবের আদেশ ছিল যে চাঁদ সদাগর পূজা না করিলে মর্ত্ত্যলোকে মনসাদেবীর পূজা প্রচারিত হইবে না।

মনসাদেবী চাঁদ-সদাগরের পূজা পাই-বার বিবিধ চেষ্টা করেন; কিন্তু পূজা করা দূরে থাকুক, চাঁদ-সদাগর তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

যখন সদয় ব্যবহারে চন্দ্রধরের প্রীতি আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইলেন, তখন মনসা তাঁহার সঙ্গে বিষম শত্রুতা জুড়িয়া দিলেন। চাঁদ সদাগরের 'মহাজ্ঞান' বলিয়া একটা শক্তি ছিল, এই শক্তির দ্বারা তিনি

সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগকে আরোগ্য করিতে পারিতেন ; মনসাদেবী যখনই সর্পদ্বারা চাঁদ-সদাগরের কোন পুত্রকে নিহত করিতে চেষ্টা পাইতেন, মহাজ্ঞান-প্রভাবে পিতা তখনই তাহাকে রক্ষা করিতেন। সুতরাং প্রথম প্রথম মনসাদেবী বিরোধ করিয়া চাঁদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মনসাদেবী পরমা সুন্দরী রমণী সাজিয়া চাঁদ-সদাগরের মনোহরণ করিলেন ; ছদ্ম-বেশিনীকে উদ্‌ভ্রান্ত বণিক্ মনসা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই ;—কুহকিনীর বাক্য ও রূপচ্ছটায় চাঁদ "মহাজ্ঞান" তাঁহাকে দান করিয়া ফেলিলেন। "মহাজ্ঞান" গ্রহণ করিয়া মনসাদেবী একটি দীপ-শিখার ন্যায় আকাশে মিলাইয়া গেলেন,—চাঁদ সদাগরের ভবিষ্যৎ দুর্ভেদ্য তিমিরাবৃত হইয়া পড়িল।

কিন্তু চাঁদের একটি বৈদ্য বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম "শঙ্কুর গারুড়ী"। গরুড় যেরূপ

অহিকুলের শত্রু, ইনিও তদ্রূপ ছিলেন বলিয়া ইঁহার এই উপাধি। এই সুহৃৎ তাঁহার প্রাণপ্রতিম। বৈদ্যরাজ সর্প-দংশনের অমোঘ ঔষধ জানিতেন; যেমন বিষধরই দংশন করুক না কেন, এই বৈদ্য রোগীকে রক্ষা করিতে পারিতেন। চাঁদের পুত্রগণকে সর্পে দংশন করা মাত্র, এই সুহৃদের সাহায্যে তাহাদের জীবন রক্ষা পাইত।

দেবী প্রথমতঃ বৈদ্যরাজকে হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু যখন তাঁহার শত চেষ্টায়ও অকৃত্রিম সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ভগ্ন হইল না, তখন সুহৃদ্বরের জীবন নাশের সংকল্প করিয়া মনসা নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বহুবার ব্যর্থ-কাম হওয়ার পরে শেষে মনসাদেবীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। বিচিত্র কৌশলে মনসা শঙ্কুর-গারুড়ীর জীবন নষ্ট করিলেন।

এবার চাঁদ-সদাগর প্রকৃতই নিরাশ্রয়। "যা করেন শিবশূলী" বলিয়া চন্দ্রধর স্বীয় সংকল্পে আরও দৃঢ় হইলেন।

বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতে একটি একটি করিয়া চন্দ্রধরের ছয়টি পুত্র সর্প-দংশনে নষ্ট হইল।

চাঁদের শোকাতুরা স্ত্রী সনকা প্রতিদিন স্বামীর চরণতল নয়নজলে সিক্ত করিয়া দেবতার সঙ্গে এই বাদ পরিহার করিতে প্রার্থনা করিতেন,—তরুণ বয়স্কা ছয়টি বিধবা রমণী ক্রূরকর্ম্মা শ্বশুরের দিকে সজল-নেত্রে তাকাইয়া তাঁহাদের শোকার্ত্ত দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার চিত্ত কোমল করিতে চেষ্টা পাইত,—বহুকালের প্রাচীন ভৃত্য 'নেড়া' এক হস্তে অশ্রু মুছিয়া অপর হস্তে গৃহের কাজ করিত ও প্রভুর পাদপদ্মে পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিত,—নানা দিগ্‌দেশ হইতে সুহৃদ্‌গণ মনসার সঙ্গে এই

বাদ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন,—সেই বহুপুত্রের প্রিয়-কথোপকথন-স্নিগ্ধ, বাদানুবাদ-মুখর, লক্ষ্মীর প্রসাদ তুল্য বিশাল প্রাসাদ শ্মশানের নির্জ্জনতা পরিগ্রহ করিয়াছিল ;—কিছুতেই চাঁদের বজ্র-কঠোর পণ শিথিল হইল না, তিনি শোকার্ত্ত-হৃদয়ে ভ্রূকুটি করিয়া স্বীয় বিপুল হিন্তাল কাষ্ঠের লাঠিদ্বারা মনসাদেবীর এই শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইয়া রহিলেন।

নিরানন্দ গৃহে কিছুতেই মন সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয় না ; সে গৃহের অবিরল অশ্রুধারা ও হাহাকারে চাঁদ-সদাগরের চিত্ত ব্যথিত হইল, তিনি সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গ সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন। তাঁহাদের অযাচিত উপদেশ ও নিন্দাবাদ অসহ্য হইল। তিনি বিদেশ-ভ্রমণে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে মনন করিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চট্টগ্রামের নাবিকগণ প্রকাণ্ড সপ্ত ডিঙ্গা নানা বাণিজ্যের উপকরণে পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া আনিল। সদাগর বাণিজ্য-যাত্রায় যাইবেন, জয় ডঙ্কা বাজিতে লাগিল,—নফর ও নকিবগণ চম্পকনগরে এই সংবাদ রাষ্ট্র করিল; সাত ডিঙ্গার মধ্যে মধুকর নৌকা সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল ও নানা কারুকার্য্য-খচিত, তাহা একখানি ভাসমান রাজ-প্রাসাদের ন্যায়; এই "মধুকরে" সদাগর আরূঢ় হইলেন; তখন দলে দলে চম্পক-নগরবাসী লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া সুদর্শন "মধুকরের" বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিতে লাগিল। নৌকাগুলি উজান বাহিয়া চলিল। এই সময়ে অপর এক দৃশ্য হৃদয়-বিদারক—চম্পক-নগরের প্রাসাদে অশ্রুপূর্ণ-মুখে ষড়্-বধূ-বেষ্টিত সনকা শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে ছিলেন; এই দুঃখের সংসারে পতি-সেবার জন্য তাঁহার যে বলটুকু অবশিষ্ট ছিল,

আজ যেন তাহাও তাঁহার দেহে আর রহিল না।

কালীদহের বিপুল আবর্ত্তে পড়িয়া সপ্ত ডিঙ্গা একান্ত বিপন্ন হইল। মনসাদেবীর আদেশে প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। কালী-দহের উত্তাল আবর্ত্ত কর্ণধারগণের প্রাণে আশঙ্কা উপস্থিত করিল,---দেখিতে দেখিতে সমস্ত জগৎ একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পরি-ণত হইল, মুসলধারে জল পড়িতে লাগিল ও ঝঞ্ঝাবাতে ডিঙ্গাগুলির ছৈ উড়িয়া গেল। সপ্ত ডিঙ্গা খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

চন্দ্রধর কালীদহের জলে ভাসিতে লাগি-লেন; এই বিপদে তিনি "শিব" "শিব" বলিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু চাঁদ সদাগর মরিলে দেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইবে না। দেবী তাঁহার বসিবার সুবিস্তৃত পত্রসংকুল শতদল চাঁদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, সদাগর তাহা

ধরিয়া ভাসিয়া থাকিতে পারে। সম্মুখে ভাসমান পত্রপল্লবসহ পদ্ম-লতা দেখিয়া চন্দ্রধর আশ্রয়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন,—কিন্তু মনসার এক নাম 'পদ্মা', সহসা ইহা মনে পড়াতে নামের সংশ্রবহেতু ঘৃণায় হস্ত আকুঞ্চিত করিয়া অকুল জলরাশিতে ডুবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন।

কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া চাঁদ তিন দিন পরে এক সমৃদ্ধ পল্লীর তীরে উঠিলেন। নগ্নদেহ আবরণের জন্য শ্মশানের কাণি কুড়াইয়া কথঞ্চিৎ লজ্জা নিবারণপূর্ব্বক বণিক্-রাজ সেই পল্লীতে প্রবেশ করিলেন।

সেই স্থানে ধনদৌলতসম্পন্ন চন্দ্রকেতু নামক বণিক্ বাস করিতেন; চন্দ্রকেতু চাঁদ সদাগরের পূর্ব্ব সখা,—এই দুঃসময়ে তিন দিন সম্পূর্ণ অনাহারে অতিবাহিত করিয়া চাঁদ চন্দ্রকেতুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্ব-সখার এই বিপদ্ দর্শনে চন্দ্রকেতু

দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদরে আপ্যায়িত করিলেন, চাঁদের শরীর মার্জ্জিত হইলও পরিস্কৃত বস্ত্র পরিয়া তিনি তিন দিনের অনাহারের পর ভোজন করিতে গেলেন। ভোজনের নানা আয়োজন হইয়াছিল; লুব্ধ বণিকের নেত্র খাদ্য দ্রব্যের উপর পতিত হওয়াতে তাঁহার রসনা সরস হইল, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু সখার প্রতি সৌহার্দ্দ্যবশতঃ তাঁহাকে মনসার সহিত বাদে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন এবং এই প্রসঙ্গে উত্তেজিত চাঁদ সদাগরের সঙ্গে তাঁহার যে বাদানুবাদ হইল, তাহাতে সদাগর জানিতে পারিলেন যে, চন্দ্রকেতু একজন মনসার পূজক, এমন কি তাঁহার বাড়ীতে মনসার ঘট স্থাপিত আছে।

ক্রোধে চাঁদের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; তখনও গণ্ডুষ করা হয় নাই, উপবাসী চাঁদসদাগর ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় আসন

হইতে উত্থান করিয়া পরিত্যক্ত শ্মশানের কাণি পরিধানপূর্ব্বক সরোষে বন্ধু-গৃহ ত্যাগ করিলেন, অনুনয়কারী বন্ধুর হস্ত দূরে সরাইয়া একবারমাত্র সঘৃণনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিয়া গেলেন, "বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কাণি"; বলা বাহুল্য চাঁদ মনসা দেবীকে "কাণি", "চেঙমুড়িকাণি" প্রভৃতি দুরক্ষর সংজ্ঞায় সম্বোধন করিতেন।

এই অবস্থায় চাঁদ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন, সেই তণ্ডুলগুলি এক স্থানে সযত্নে রাখিয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন; স্নানান্তে তাহা নিজে পাক করিয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে মনসাদেবী গণদেবের মূষিকদ্বারা সেই তণ্ডুলগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; ক্ষুধার্ত্ত চাঁদ আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কষ্ট-সঞ্চিত পুটুলীতে একটি মাত্র তণ্ডুলকণাও অবশিষ্ট নাই,

তখন ক্রুদ্ধনেত্রে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন এবং ছয় পুত্রের শোকে যে প্রাণ নষ্ট হয় নাই, অনাহারে এত সহজে তাহা যাইবার নহে, কিংবা তাঁহার পণ ভগ্ন হইবার নহে—ইহাই অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিয়া মনসাদেবীকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

বিবিধ রস-পূর্ণ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যে যিনি আত্মীয়স্বগণকে নিত্য পুষ্ট রাখিয়াছেন, সেই বণিক্-কুলচক্রবর্ত্তী দেশপ্রসিদ্ধ চন্দ্রধর নদী-তীরে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। কতকগুলি কাঠুরিয়া সেই পথে যাইতেছিল, তাহারা চাঁদকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দরিদ্র মনে করিল এবং তাহাদের সঙ্গে বনে কাঠ কাটিলে তিনি লাভবান্ হইতে পারেন, এই ভরসা দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ, সৌম্যকান্তি, শ্মশানের কানি-পরিহিত প্রায় দিগম্বর বণিক্‌রাজকে তাঁহার উপাস্যদেবতা চন্দ্রচূড়ের মতই দেখা যাইতে লাগিল।

চাঁদ কাঠুরিয়াগণ অপেক্ষা কাষ্ঠ বেশী চিনিতেন। তিনি চন্দনকাষ্ঠের একটা প্রকাণ্ড বোঝা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে নগরের হাটের দিকে যাত্রা করিলেন। মনসাদেবীর আদেশে অদৃশ্য-ভাবে বায়ুপুত্র সেই কাষ্ঠের বোঝার উপর পদাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তাহাতে বোঝা এত ভারি হইল যে, চাঁদ আর তাহা মাথায় বহন করিতে পারিলেন না।

এইরূপে পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া চাঁদ-সদাগর এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পরিচারক-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, প্রভুর আদেশে আশুধান্য নিড়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মনসাদেবীর কুহকে চাঁদ ধান্য এবং খড়

উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া খড়ের পরিবর্ত্তে কতকগুলি ধান্য উত্তোলন করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণগৃহ হইতে তাঁহার জবাব হইল। বিমর্ষ-চিত্তে চন্দ্রধর জঙ্গলে ঘুরিতে লাগিলেন; একান্ত উন্মনস্কভাবে বিচরণ করিতে করিতে তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মনসাকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সেইস্থানে কতকগুলি ব্যাধ পক্ষী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছিল,—পক্ষীগুলি ফাঁদের নিকট আসিয়াছে, এমন সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত সদাগরের অসাবধান পাদক্ষেপে ও অর্দ্ধোক্তিতে চমকিত হইয়া তাহারা উড়িয়া গেল। তখন ব্যাধগণ ক্রুদ্ধ-চিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল—

"কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে,
কোথা হৈতে কাল তুই এলি ভেড়ের ভেড়ে।"

সদাগর তাহাদের নিন্দাবাদ ও কটূক্তি শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,

তাহারা তাহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের মনোরম স্নিগ্ধ আলো বনান্তভূমির শীর্ষে কিরীটের শোভা দান করিয়াছিল, পল্লী হইতে চাষাদের মেঠো সুরে ভাটিয়াল রাগিণী গীত হইয়া বনান্তে লীন হইয়া যাইতেছিল,নিবিড় বনরাজির ক্রোড় ত্যাগ করিয়া তমিস্রা সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছিল ;—শ্মশানের কাণিপরিহিত, কাঞ্চনপ্রতিম প্রৌঢ় দিগম্বর-মূর্ত্তি সদাগর আকাশপানে তাকাইয়া যুক্তকরে বলিলেন,"ভগবন্, তোমার সেবক আত্মপ্রসাদ ভিন্ন আর কিছু চাহে না ; এই অত্যাচারে যেন তোমার প্রতি নির্ভর না হারাইয়া ফেলি। তোমার সেবার পরিবর্ত্তে যে মণিময় হর্ম্ম্য ও রাজ-সম্পৎ, প্রিয় পুত্রকলত্র লাভ—তাহা যেন কখনই বাঞ্ছনীয় মনে না করি।" সেই নিবিড় বনপ্রদেশে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় চন্দ্রধর-

বণিক্ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া মহেশ্বরের শ্রীচরণোদ্দেশে কয়েক বিন্দু অশ্রু,—শুধু কয়েক বিন্দু অশ্রু উপহার প্রদান করিলেন; একটি বিল্বপত্র ও একটি জবাফুলের সন্ধানে সদাগরের চক্ষু ইতস্ততঃ ধাবিত হইল, কিন্তু তথায় তাহা জুটিল না।

(২)

চাঁদবেণে এই অবস্থায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সনকা স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সাত ডিঙ্গা ডুবিয়া গিয়াছে,—তাঁহাদের বড় সাধের "মধুকর ডিঙ্গা" খানি ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া জলমগ্ন হইয়াছে, শুনিয়া সনকা শোক-বিহ্বলা হইলেন; লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে উপর্য্যুপরি বিপৎপাত হয়; নির্ব্বংশ সদাগরের গৃহে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পাদপদ্মের অলক্তকরাগ মুছিয়া যাইতেছে, "মধুকর" ডিঙ্গার নাশে সনকা

তাহারই আভাস পাইলেন, সনকা তাই কাঁদিয়া সদাগরের নিকট বিনাইয়া বিনাইয়া বারংবার শুধাইতে লাগিলেন—

"শুন সদাগর, কোথা মধুকর,
কহ তব পায়ে পড়ি।"

সদাগর নিজে যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা সনকাকে বলেন নাই; কিন্তু স্বাধ্বী স্বামীর উন্নত দর্পণোপম ললাটের কালিমা দর্শনে সেই কষ্টের ইতিহাস বুঝিতে পারিলেন। রাত্রিদিন সনকার মন জ্বলিতে লাগিল; তিনিও অশ্রুসিক্ত নেত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মনসাদেবীকে বলিলেন, "আমরা তোমার ভক্তি সদাগরের প্রাণে সঞ্চার করিতে পারিলাম না, এমন কাহাকেও আমাদের গৃহে আনিয়া দাও, যাহার চেষ্টায় এই অসাধ্যসাধন হয়, তোমার ঘট তুমি স্থাপিত করিয়া যাও; আমাদিগকে আর কত পরীক্ষা করিবে! আমাদের হৃদয়

বড় দৃঢ়, পাষাণ হইলে তাহা এরূপ কঠোরাঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইত!"

আবার সদাগরের বিশাল গৃহে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিয়াছে; প্রতিবাসিনীরা বলিয়া উঠিল "ঐ যা সনকা রাণীর আর একটি পুত্র জন্মিল, উন্মাদ চন্দ্রধর মনসার সঙ্গে বাদ করিয়া এটিও হারাইবে, আহা শিশুর কি চাঁদপানা মুখ।" সনকা সেই সূতিকাগৃহে শিশুর শরচ্চন্দ্রনিভ প্রফুল্ল মুখখানি দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠে, তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত শোকার্ত্ত নিরুদ্ধ-স্নেহ সেই শিশুর মুখদর্শনে উথলিয়া উঠিল, তিনি জানিলেন এ পুত্রও মনসাদেবী রাখিবেন না। এক-চক্ষের প্রান্তে আশঙ্কাজনিত অশ্রু-পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতৃস্নেহ এমনই প্রবল যে, অপর চক্ষু শিশুর বদনচন্দ্রমা দর্শনে প্রীতি-ফুল্ল হইল — যেন বহুদিনের জ্বালা সহসা

জুড়াইয়া গেল। গৃহ হইতে লক্ষ্মী পাছে অন্তর্হিত হন, এই ভয়ে সনকা ভীতা ছিলেন, লক্ষ্মীকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার ফাঁদস্বরূপ পুত্রের নাম "লক্ষ্মীন্দ্র" রাখিলেন, এই নাম আদরে আদরে শেষে "লখাই" এবং আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া "নখা"তে পরিণত হইয়াছিল।

চাঁদ-সদাগর পুত্রমুখ দর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন ; পুত্রের অসামান্য রূপ-দর্শনে তিনি ভীত হইলেন, এ পুত্র মনসার কোপানলে আহুতিস্বরূপ হইলে তিনি কি করিয়া স্থির থাকিবেন ? তিনি অহর্নিশ মহেশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতেন ; দৈবজ্ঞ তাঁহাকে নিভৃতে বলিয়া গেল বাসরঘরে 'দুর্লভ' লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। ইহা শুনিয়া সদাগরের গভীর নিশ্বাস পতিত হইল ; তিনি সংসারের সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে যে শান্তিময়

স্থান আছে, অন্ধকারে রত্নান্বেষী ব্যক্তির ন্যায় তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন, অবিরত তাঁহার মুখে 'হর' 'হর' শব্দ ধ্বনিত হইত—পুত্রের অশুভ কথা তিনি সনকাকে জানাইলেন না, নিজে সেই মহাপরীক্ষার দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীন্দর কৈশোর অতিক্রম করিল। সনকা মায়ার ফাঁদে পা' দিয়াছেন, দিবারাত্রি 'লখা'র জন্য কত শত অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু চাঁদ সদাগর পুত্রকে ততটা আদর করেন না, সনকা তাহাতে দুঃখিত হন ; কিন্তু চাঁদ যে কারণে লক্ষ্মীন্দরকে আদর করিতে যাইয়াও ফিরিয়া আসেন, তাঁহার পিপাসিত নেত্রদ্বয় যখন পুত্রমুখসুধা পান করিতে লালায়িত হয়, তখনও যে কারণে তিনি লোলুপ চক্ষুদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করেন, তাহা সনকা জানিতেন না, সুতরাং তিনি ভাবিতেন স্বামী

শোকে দুঃখে উন্মনা ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বের মত আর তাঁহার কোমল হৃদয় নাই, তিনি নির্ম্মম জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন।

নব-যৌবনে লক্ষ্মীন্দর বণিক-গৃহের দীপ স্বরূপ হইল; একটি মাত্র দীপের জ্যোতিতে যেরূপ সমস্ত আঁধার ঘুচিয়া যায়, সেই বিশাল প্রাসাদ লক্ষীন্দরের রূপ গুণে তদ্রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লক্ষীন্দরকে সেই গৃহের সকলে 'দুর্ল্লভ নখা' বলিয়া ডাকিত,—বড় দুঃখে, বড় কষ্টে ও বড় তপস্যায় 'নখা'-কে পাওয়া গিয়াছে, এজন্য সে 'দুর্ল্লভ'।

নখা এখন নবযৌবনে প্রবৃত্ত, সে নিজের জাতি-ব্যবসায় শিখিয়াছে; কাব্য নাটক অলঙ্কার পাঠ করিয়াছে; সে শুধু চন্দ্রধরের গৃহের গৌরব নহে, সে সেই বিশাল চম্পক-নগরীর গৌরব স্থল; যেখানে 'নখা' পদার্পণ করে, সেই স্থানের সকলের মুখে আনন্দের

রেখা অঙ্কিত হয়,—তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেই লোকে কৃতার্থ বোধ করে। কেবল মাত্র সদাগর সমস্ত ধর্ম্ম-বুদ্ধির শক্তি সবলে হৃদয়ে উদ্বোধন করিয়া লখাই হইতে একটু দূরে থাকেন,—আদরের ধনকে আদর করিতে সাহস পান না, যাহাকে বক্ষে রাখিবেন, তাহাকে স্বীয় কক্ষে আনিয়া কথা বলিবার সময় মুখ অবনত করিয়া শিব স্মরণ করেন।

ষড়বধূ বিধবা ;—রমণীবর্গের মধ্যে একমাত্র সনকা মৎস্যাহারী,ষড়বধূর জন্য নিরামিষ হাড়ি উনুনে স্থাপিত হয়, দেখিয়া সনকার অন্ন ব্যঞ্জন মুখে রুচে না। নিজে যখন দুঃখরেখা কুঞ্চিত ললাটে সিন্দুর পরিতেন, তখন বধূগণের শুভ্র চন্দ্রোজ্জ্বল ললাট শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত ;—আর কাহাদেরে লইয়া সন্ধ্যাকালে কেশ বিন্যাস করিবেন! আর কাহাদের কপালে সিন্দুর বিন্দু

আঁকিয়া দিবেন! আর কাহাদের তাম্বুল-রঞ্জিত প্রিয় ওষ্ঠাধর দেখিয়া পুলকিত হইবেন! শাঁখারীকে বৎসরান্তে কাহাদের জন্য নানাপ্রকার কারু-খচিত শাঁখার কথা বলিয়া দিবেন! যাঁহাদের লইয়া এই সকল আনন্দ-লীলায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাহারা সিন্দূরের কোটাটি দেখিলে লুকাইয়া যে অশ্রুবিন্দুটি অঞ্চলাগ্রে মুছিয়া ফেলে, সনকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা এড়ায় না, সনকা কিছু না বলিয়া তখন নিজের প্রকোষ্ঠে যাইয়া একা একা কাঁদিতে থাকেন;—হয়তঃ সেদিন তাঁহার কিছু খাওয়া হয় না। সুবর্ণ চিরুণী দিয়া স্বীয় কেশ আঁচড়াইতে যাইয়া সনকার চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে। হায় বিধাতঃ! প্রৌঢ়া যাহা কর্ত্তব্যের দায়ে করিয়া থাকেন, তাহা যে যৌবনের নিজস্ব ধন;—সুন্দরী যুবতীরা গৃহে তপস্বিনীর ব্রত সাধন করিবেন, আর প্রৌঢ়া কি করিয়া তাম্বুল, মৎস্য ভোগ করিবেন, স্বর্ণ

চিরুণীতে কেশ আঁচড়াইবেন! অথচ তাহা না করিলে নয়।

সনকা একদিন সন্ধ্যায় স্বামীর পা' জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমার দুর্ল্লভ নথার একটি বউ আনিয়া দাও, লক্ষ্মী বউ অলক্তক-রঞ্জিত নূপুর-মুখর ক্রীড়াশীল পদে এই গৃহে বিচরণ করিবেন,—আমি সেই প্রিয় শব্দ শুনিব এবং আঙ্গিনায় সেই অলক্তক-চিহ্ন দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, আমার স্বর্ণকোটা ভরা সিন্দুর আমি তাহার সুন্দর কপালে পরাইয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব।"

সহসা পথিক সর্পের দেহ পদে স্পর্শ করিলে যেরূপ চমকিয়া উঠে, এই প্রস্তাবে চাঁদসদাগর তেমনই চমকিয়া উঠিলেন। বাসর ঘরের আতঙ্ক তাঁহার মনে উপস্থিত হইল; তিনি সনকার প্রার্থনাকে একবারে অগ্রাহ্য করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় সনকা দাঁড়াইয়া রহি-

লেন, — তখন নদীনীর-সিক্ত পবন গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলাগ্র যেন সস্নেহে স্পর্শ করিতেছিল, — পূর্ব্বাকাশের নীলিমা ভেদ করিয়া "সন্ধ্যা-মাণিক" স্বামী-উপেক্ষিতার গণ্ডপ্রবাহিত অশ্রুধারাকে উজ্জ্বল করিতেছিল,—তাঁহার এত সাধের কথাকে এরূপ নির্ম্মম ভাবে স্বামী উপেক্ষা করিলেন, সনকার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত দুঃখ আজ উথলিয়া উঠিল, তিনি দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নথাই পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যা-কালের আহারার্থ্যের জন্য মাতাকে খুঁজিয়া চলিয়া গেল,—সনকা তাঁহার 'মা মা' আহ্বান শুনিতে পাইলেন না। এক প্রহর কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইল, সনকার হৃদয়ের ব্যথার হ্রাস হইল না। পুত্রশোকে যিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করিতেন, আজকার দুঃখে তিনি নীরব রহি-

লেন ; এরূপ দুঃখ সম্পূর্ণ অভিনব, ইহাতে তিনি অভ্যস্ত নহেন। শুধু গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, আর নৈশ নক্ষত্র গবাক্ষপথে সেই উপেক্ষা-সম্ভূত অশ্রুবিন্দুকে স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিতে-ছিল, রোরুদ্যমানার বাহ্য জ্ঞান নাই, তিনি আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চাঁদ বাহিরের দরবার ছাড়িয়া যখন রাত্রিতে স্বপ্রকোষ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন,তখন দেখিতে পাইলেন, নীরবে অশ্রুমুখী সনকা দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া সনকা তাঁহার আহার্য্যের সন্ধানে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন; চাঁদ তাঁহাকে আদরের সহিত সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, "তুমি কি সেই হোতে এখানে দাঁড়াইয়া আছ?" স্বামীর আদরে সনকার চক্ষু হইতে দর দর প্রবাহে জল পড়িতে লাগিল, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

চাঁদ-সদাগর অভিমানিনীর মনের ব্যথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দৈবজ্ঞের কথা সনকাকে বলিলে পুত্রবৎসলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ; দৈবজ্ঞের কথা যে ফলিবে, তাহারই বিশ্বাস কি ? লখার বিবাহ দিবার কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর আশঙ্কা হইয়াছিল, তিনি কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

নিজের কোঁচার খুটে সনকার অশ্রু মুছা-ইয়া দিয় বলিলেন,—মনসা দেবীর প্রতি-কূলতা এখনও আছে, ছয়টি বিধবা বধূ যে গৃহকে শ্মশান-সমান করিয়া রাখিয়াছে, সেই গৃহে অন্য একটি বধূ আনিতে তাহার সাহস হয় না, সেই সুখ যদি প্রতিবাদী দেবতার বুকে না সহে।

সনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,"তুমি লখাকে আদর ক'র না, এ কষ্ট আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমার বড় দুঃখের

ধন নখা, তুমি তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহ না, তুমি নির্ম্মম, বাছাকে কি চিরকাল অবিবাহিত রাখিবে! মনসা দেবী আর কষ্ট দিবেন না, নখার বউ ঘরে না আসিলে আমার এই শূন্য ঘর কে পূরণ করিবে, আমার বড় সাধ বধূর সহিত নখাকে লইয়া আবার সংসার পাতি—তুমি বাদী হইও না," এই বলিয়া সনকা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চাঁদ-সদাগরের পদতলে নিপতিত হইলেন।

চাঁদ ভ্রূকুটি করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"দৈবজ্ঞের কথা যে নিশ্চয় ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আর বাসর ঘরের ব্যবস্থা আমি এমন করিব যে, মনসা প্রতিকূল হইলেও কিছু না করিতে পারে। এই হতভাগিনী দুঃখিনীর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না।"

সযত্নে সনকাকে উঠাইয়া চাঁদ বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না। পুত্রবধূ ঘরে

আনিব, কুলপুরোহিত জনার্দ্দনকে ডাকিয়া উপযুক্ত বধূর সন্ধান দেখ।”

তখন নিছনি-গ্রামের বণিক সায়-সদাগরের কন্যা বেহুলা প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা হইয়া উঠিয়াছে; বেহুলার কণ্ঠস্বর কোকিলের মত, বেহুলার ন্যায় কোন নর্ত্তকীও নাচিতে পারিত না, বেহুলা রন্ধন-কার্য্যে সিদ্ধ-হস্তা ও সুলেখিকা,—আর বেহুলার রূপ দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র মলিন হইয়া যাইত, নিতম্বলম্বিত কুন্তলরাজি দেখিয়া কাদম্বিনী মেঘের আড়ে লুকাইত। বেহুলাকে প্রতিবাসীগণ ক্ষেপা মেয়ে বলিয়া ডাকিত; এই মেয়ে যেখানে যাইত, সেখানে তাহার কথা লোকে শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লইত, তাহার সরল বুদ্ধির কথায় অনেক গৃহস্থের কূট দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত—যেখানে বেহুলা থাকিত, তাহার নৃত্যগীতে সেস্থানে আনন্দের উৎস ছুটিত, লোকে আদর

করিয়া তাহাকে "বেহুলা নাচুনি" বলিয়া ডাকিত।

বস্তুতঃ বেহুলা অপরাপর বালিকার মত ছিল না। সে সংসারে থাকিয়া যেন কোন স্বর্গের কল্পনায় নিযুক্ত থাকিত ;—সমবয়স্কা বালিকাগণ যখন দেখিত বেহুলা যোগিনীর ন্যায় কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া সন্ধ্যাকালে নদী-তীরে ঊর্দ্ধ-নেত্রে একা বসিয়া আছে,—ঠিক একখানি নিশ্চল চিত্রের ন্যায়, তাহার একগাছি কেশও বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে না,—তখন সেই পুণ্যবতী ধ্যান-শীলার চিন্তাস্রোত ভগ্ন করিয়া তাহারা কথা কহিতে সাহস পাইত না, স্থির হইয়া তাহার পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিত। কখনও কোন সদ্যঃ বিধবার শোক-লুণ্ঠিত শিরোদেশ নিজ অঙ্কে রাখিয়া বেহুলা তাঁহার আলু-লায়িত কুন্তল মার্জ্জনা করিতে করিতে দুএকটী অশ্রুবিন্দু পাত করিত, তখন

তাহাকে ঠিক একটি দেবতার ন্যায় দেখাইত, শোকার্ত্তার বিহ্বল চক্ষু তাহার দিকে পড়িলে সে মনে ভাবিত, তাহার দুঃখ যেন স্বর্গের কোন্ করুণাময়ী দেবীর বুকে বাজিয়াছে, তিনি স্বর্গের সুখ ত্যাগপূর্ব্বক তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বেহুলা কথা বলিত না, কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ করুণার ভাবে অপূর্ব্ব শান্তি বিতরণ করিত।

কখনও কোন জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ চক্ষে বেহুলা দেখিত,—সতী স্বীয় উজ্জ্বল ললাটদেশ সিন্দুর-রঞ্জিত করিয়া কোন স্বর্গলোক দেখিতে দেখিতে স্বামীর পার্শ্বে পুড়িয়া ছাই হইতেছেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া বেহুলার গণ্ডদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, যে পুণ্যলোকে সতী চলিলেন, তাহা বেহুলার চক্ষে যেন প্রত্যক্ষবৎ মনে হইত।

কখনও সীতার কষ্ট পড়িতে পড়িতে

শিশিরপ্লুত পদ্মদলের মত তাঁহার চক্ষু ভারা-ক্রান্ত ও রক্তিম হইত, কিন্তু যখন সাবিত্রী কিরূপে মৃত স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মৃত্যুর নিকট হইতে তাহার পুনর্জীবন উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন— বেহুলা সেই কাহিনী পাঠ করিত, তখন সেই পুণ্যময়ী সতীর ভাব তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিত, বালিকা একবারে তন্ময় হইয়া যাইত।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে যখন বালিকা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে, তখন সায়বেণে বর খুঁজিতে খুঁজিতে পাত্রীসন্ধানে ভ্রমণ-শীল জনার্দ্দন-শর্ম্মার মুখে চাঁদসদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের কথা জানিতে পারিলেন।

চাঁদ-বেণে স্বর্ণ চতুর্দ্দোলায় চাপিয়া নিছনি নগরে আসিলেন। কন্যাকে পাকা দেখা হইবে,—একশত ভারী তত্ত্ব লইয়া চলিল, সন্দেশ, মুরখী, চিপীটক, রসাল পাণের বীড়া, ঝালের লাড়ু, চাপাকলা প্রভৃতি নানা খাদ্য-

দ্রব্য, ঢাকাই ও বারাণসী সাড়ী, উড়িষ্যার বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার, বহুমূল্য হীরার হার, মণি-খচিত স্বর্ণচিরুণী প্রভৃতি লইয়া পরিচারকেরা আগে চলিয়া গেল।

চাঁদ সায়বেণের গৃহে পরম আদরে আপ্যায়িত হইলেন। মেয়ে দেখিয়া চাঁদের চক্ষু জলপূর্ণ হইল; মেয়ে ত নয়, এ যেন পদ্মাসন ছাড়িয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণী ভূতলে দাঁড়াইয়াছেন,—পায়ের আলতা নহে, উহা রক্তপদ্মের রজঃ। এই বধূকে পাইলে সনকার প্রাণ সত্য সত্যই জুড়াইবে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সংসারের মায়া-বন্ধনে ধৃত হইতেছেন,—ভাবিয়া সদাগর নীরবে হৃদয় হইতে সাংসারিক সুখের আশা সরাইয়া ফেলিলেন। রক্তচন্দনের ফোটা ললাটে ছিল, রক্ত পট্টবাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ‘শিবদুর্গা’ স্মরণ করিয়া চন্দ্রধর

মুহূর্তের জন্য সংসারের উর্দ্ধে শান্তিতে স্থিত হইলেন।

চাঁদ সায়বেণেকে বলিলেন, মেয়ে তাঁহার মনোনীত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের একটা কৌলিক প্রথা আছে, কন্যাকে তদনুসারে পরীক্ষা করিতে হইবে। লৌহনির্ম্মিত কলাই রন্ধন করিয়া কন্যা পরিবেশন করিবেন। কন্যা যদি লক্ষ্মী হন, তবে লৌহের কলাই ডালের মত গলিয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া বেহুলার মাতা অমলা কাঁদিতে লাগিলেন, এমন কথা কে কোথা শুনিয়াছে, লৌহের কলাই অগ্নিজ্বালে কে কবে গলায়েছে! সায়-সদাগর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বেহুলা আসিয়া বলিল, "তোমরা ভয় পাইয়াছ কেন? আমি বারমাসে বার ব্রত করিয়া থাকি, প্রতি অমাবস্যায় উপবাসী থাকিয়া মনসাপূজা করিয়া আসিয়াছি,

দেব-প্রসাদে আমি লৌহের কলাই সিদ্ধ করিয়া ফেলিব।”

কাঁচা মাটির তিনটা ঝিক্ গড়িয়া নূতন উনন প্রস্তুত করা হইল। ছয় গণ্ডা লৌহের কলাই আনিয়া নূতন হাঁড়িতে পূরিয়া জল-পূর্ণ করা হইল, বেহুলা মনসাদেবীকে স্মরণ করিয়া উননে আড়াই কুড়া জ্বাল দিয়া আগুন জ্বালিলেন, দেখিতে দেখিতে লৌহকলাই সিদ্ধ হইয়া গেল। অমলা ও সায়বেণে বিস্ময়ে ভাবিলেন, ‘আমাদের গৃহে কন্যারূপিণী এ কে?” সহচরীরা ভাবিল, ‘আমাদের সঙ্গে যিনি খেলা করেন, তিনি অসামান্যা, আমাদের মত নহেন,’—প্রতিবাসিরা বলাবলি করিল, ‘এ ক্ষেপা-মেয়ে কোন শাপভ্রষ্টা দেবী।’ চাঁদ-সদাগর বুঝিলেন এ কন্যা লক্ষ্মীন্দরের যোগ্যা। গণক আসিয়া বর-কণের রাশি মিলাইয়াও তাহাই বলিয়া গেল।

(৪)

চাঁদ গৃহে আসিয়া বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অপরাপর উদ্যোগ অন্য-হস্তে অর্পিত হইল, স্বয়ং চাঁদ সাতালী-পর্ব্বতে লৌহের বাসর নির্ম্মাণ করিতে কামিলা নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই লৌহ-গৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। প্রকাণ্ড লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ উত্থিত হইল। সাতালী-পর্ব্বতের প্রস্তর খুঁড়িয়া লৌহময় ভিত্তি নির্ম্মিত হইল,—তদুপরি লৌহের তোরণ মেঘ স্পর্শ করিয়া রহিল এবং বিশাল লৌহ-গৃহ যমপুরীর কারাগৃহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই গৃহের বহির্দ্দেশে শত শত শাস্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত রহিল। বহুসংখ্যক নেউল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সেই বিশাল লৌহ-প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; তাহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও

নখাগ্র সর্পদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিল। নেউলদিগের শ্রেণী হইতে ঈষৎ দূরে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য পুচ্ছ উন্মুক্ত করিয়া শিখিনীরা ভ্রমণ করিতে লাগিল; তাহাদের পদাঙ্গুলী ও চঞ্চু সর্প ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া সাতাল-পর্ব্বতের গাত্রে তৃণসম্প ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বৃক্ষ-মূল ও লতা-গুল্ম বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের তীব্রগন্ধে সর্প-সমাজ সাতাল-পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরে প্রস্থান করিল।

মনসাদেবী আকাশ হইতে এই দৃঢ়-রক্ষিত পর্ব্বতদুর্গ দেখিয়া চিন্তান্বিতা হইলেন। তিনি লৌহের বাসর-ঘর নির্ম্মাতাকে দেখা দিয়া বলিলেন, একটী কেশ প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র লৌহের গৃহ-দেয়ালে রাখিতে হইবে। কামিলা দেবীকে দেখিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,

"আমাকে সদাগর বেতন ও পুরস্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিয়াছেন, এখন যন্ত্র লইয়া কোন অছিলায় সেই গৃহে পুনঃ-প্রবেশ করিব!" দেবী তাহাকে ভয় দেখাই-লেন,—এমন কে দৃঢ়চেতা পুরুষ আছে যে, বিষহরী-দেবীর ক্রোধকে ভয় না করে? কামিলা সম্মত হইয়া গৃহ পুনরায় ভাল করিয়া দেখিবার ছলে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রস্তুত করিল এবং তাহা কয়লার গুঁড়া দিয়া পূর্ণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

লক্ষ্মীন্দর বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের অভাব নাই; হস্তী, অশ্ব ও চতুর্দ্দোলে-আরূঢ় শত শত আত্মীয় লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে যাত্রী হইলেন। বরযাত্রি-গণের বিচিত্র স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ, উষ্ণীষের মণি ও হীরার হারের জ্যোতিতে নিশাকালে যেন রৌদ্রকিরণ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বহুমূল্য মুকুট মস্তকে পরিয়া লক্ষ্মীন্দর যেন-

নই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, চৌকাঠে তাঁহার মুকুট ঠেকিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল,—চোপদার অমনি তাহা উঠাইয়া মাথায় পরাইয়া দিল;—এই অশুভ ঘটনা সনকা প্রত্যক্ষ করেন নাই, চাঁদ-সদাগর দেখিয়াছিলেন, আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল।

তিন সহস্র গন্ধ বণিক,—তন্মধ্যে ১৪০০ কুলীন বরযাত্রী হইয়া চলিলেন; তিন শত ভাট সেই বিবাহের গান রচনা করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল; বহুসংখ্যক মালী, তের শত গাবর, পট্টবস্ত্র-পরিহিত সাত শত ধোপা, অসংখ্য নাপিত, তাঁতি, যুগী ও সপ্ত সহস্র বিদ্যুৎ-বাজিকর নিছনি-নগরের অভিমুখে চলিল; স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোলা ৭ শত এবং ৭০ খানি স্বর্ণ-পালঙ্ক এই মিছিলের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। গজমুক্তার ঝালর-শোভিত আস্তরণ-মণ্ডিত

গজরাজে আসীন চন্দ্রধর সুহৃৎ ও অন্তরঙ্গ-বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিলেন ;—শত শত মশালচী সেই দলের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল ;—মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদর্শন গন্ধর্ব্ব-রাজ-কুমারের ন্যায় লক্ষ্মীন্দর অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। তাঁহার মস্তকে মণিময় মুকুট, কণ্ঠে লবঙ্গ, রঙ্গন ও বকুল ফুলের মালা মুক্তাহারকে সুগন্ধ-বিশিষ্ট করিতেছে, হস্তে শুভবিবাহচিহ্ন দর্পণ, কাটারী ও তরুণ কদলীমঞ্জরী,—মুকুট-শীর্ষে চণ্ডীর নির্ম্মাল্য ও স্বর্ণময় উত্তরীয়প্রান্তে মাতৃ-দত্ত একটী লেবু বাঁধা।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ও লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে দেখিয়া মনে করিল, তাহারা হাতে চাঁদ পাইয়াছে। সেই শুভ লগ্নের মুহূর্ত্তকালব্যাপী সুখ তাহারা দুর্লভ মনে করিল ; একমুহূর্ত্তে যে সুখের আস্বাদন পাইল, তাহা ছাড়া জীবন মরু হইয়া যাইবে, অথচ মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে

সে আনন্দের কণাও তাহারা জানিত না। মুহূর্ত্ত-মধ্যে জীবনের একটা অধ্যায় আরম্ভ হইল। তাহা একবারে নূতন।

অমলা জামাতাকে বরণ করিয়া লইলেন, সোনার প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া অমলা স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে জামাতার মুখখানি দেখিলেন, তাঁহার ছয়টি পুত্র ছিল, সেই দৃষ্টির সঙ্গে যেন লক্ষ্মীন্দর তাঁহার প্রিয়তম সপ্তম পুত্রের স্থলে অভিষিক্ত হইল।

অমলার শয়নগৃহ অতি পরিপাটী; তাহার স্তম্ভের ঊর্দ্ধে ব্যাঘ্রমুখ নৃত্যশীল শারিকা-দের বিহার-স্থান। গৃহের ছাদ আকাশ-স্পর্শী, গৃহটির নাম "উদয়-তারা।" উদয়-তারার ছাদের সঙ্গে সংলগ্ন মণি মুক্তার ঝালর-বিশিষ্ট, মুক্তা-শ্রেণী-গ্রথিত শতদল ও বিবিধ পুষ্পপল্লবাঙ্কিত বিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে বিবাহের স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই চন্দ্রাতপের অধোভাগে হেমছত্র প্রসারিত

ছিল,—তাহার নিম্নে রক্ত পট্টবস্ত্র-পরিহিত লক্ষীন্দর পুষ্পমাল্য গলে পরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ;—বামভাগে বেহুলার স্বর্ণ-খচিত অঞ্চলাগ্র তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্তে আবদ্ধ ছিল। যখন লক্ষীন্দর মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময় সহসা সেই হেমছত্র ভাঙ্গিয়া দম্পতির মাথায় পড়িল। বিবাহ-সভায় কি হইল কি হইল বলিয়া একটা পরিতাপ-সূচক কলরব উত্থিত হইল। অমলা বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সায় বেণে সেই হেম-ছত্র পুনরায় সুদৃঢ় করিয়া উত্থিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরি-সাধু পুর-ললনাগণের কাতরোক্তি ও আক্ষেপ থামাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সভা হইতে একটু দূরে যাইয়া হিন্তালের যষ্টি হস্তে উন্নতদেহ, তেজঃপুঞ্জ সদাগর দুইটি শঙ্কাপূর্ণ চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্থিত

করিয়া মহেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগি-লেন।

বিবাহান্তে চাঁদ-সদাগর সায়-বেণেকে বলি-লেন,"আমি এখনই পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া চম্পক-নগরে যাত্রা করিব।" বিবাহের রাত্রি কন্যার পিতৃগৃহে বঞ্চন করাই বরের চিরাগত প্রথা। সায়-সদাগরের মাতুল বর্দ্ধমানের নীলা-ম্বর দাস ঘোর আপত্তি উত্থাপিত করিলেন, চাঁদ সদাগরের খুল্লতাত—লক্ষপতির জামাতা ধনপতি ও চাঁদের এই প্রস্তাব বিধি-বিরুদ্ধ বলিয়া বাঁকিয়া বসিলেন। এ দিকে অমলা-প্রমুখ নিছনি-বাসিনী রমণীকুল এই অনুচিত প্রস্তাবে বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

চাঁদ বেহাইকে বির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র জল-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। সায়-বেণে

তাঁহার এই ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন ; চাঁদ বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "বেহাই আমার দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু যে কষ্টে আমার চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা সামান্য নহে। বিবাহের বাসরগৃহে আমার পুত্রের সর্পদংশনে জীবন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, দৈবজ্ঞেরা ইহাই গণিয়া বলিয়াছেন। আমার ছটি পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মনসার সঙ্গে আমার বাদ বিসংসাদের কথা আপনারা অবগত আছেন। আমি চম্পক-নগরের সীমান্তে সাতালী পর্ব্বতে লৌহ নির্ম্মিত সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, অদ্য রজনী পুত্র ও পুত্র-বধূকে সেই গৃহে রাখিব। এই বিপদ কাটিয়া গেলে নখা বধূকে লইয়া এখানে আসিবে, এবং যত দিন আপনারা ইচ্ছা করিবেন, তত দিন থাকিয়া যাইবে, সে ত আপনাদেরও সন্তান হইল।"

সায়বেণে দুঃখের সহিত বলিলেন—"আপনি এ সকল কথা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন কেন? এমন জানিলে কে এ স্থলে তাহার দুহিতার সম্বন্ধ করিতে সম্মত হইত?"

৫

চাঁদ সদাগর পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সাতালী-পর্ব্বতে লৌহ-গৃহে রাখিলেন। স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় যষ্টি-হস্তে সেই গৃহের শাস্ত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া অনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

সেই লৌহ-গৃহে প্রবেশ করিতে সহসা বেহুলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সহসা অসাবধান হস্তক্ষেপে বেহুলা নিজের সিঁথির সিন্দূর মুছিয়া ফেলিলেন,—আশঙ্কায় অশ্রুমুখী বেহুলা জলভরা একখানি রৌদ্র দীপ্ত মেঘের ন্যায় রূপচ্ছটায় গৃহ আলোকিত করিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন।

গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া নিজেই আবার সিন্দূর পরিলেন।

বেহুলা দৈবজ্ঞের গণনায় কথা শুনিয়া ছিলেন। তিনি স্বামীকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রঙ্গন-ফুলের মালাটি তাঁহার বক্ষের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া চন্দনদীপ্ত মূর্ত্তিকে বনদেবতার ন্যায় সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মালাটি যথা-স্থলে বিন্যস্ত করিবার জন্য ভীরু বালিকা হস্ত প্রসারিত করিয়া যেমনই স্বামিদেহ স্পর্শ করিয়াছে, অমনই লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—"আমার নয়নের তারা, প্রাণের প্রতিমা, একবার আমার বাহুবন্ধনে ধরা দাও", বলিয়া লক্ষ্মীন্দর তাহাকে নিকটে আসিতে বলিল।—লজ্জাবতী দূরে সরিয়া গেল, সে ধরা দিল না; লক্ষ্মীন্দর পুনশ্চ ঘুমাইয়া পড়িল।

বিনিদ্রচক্ষে বসিয়া বেহুলা স্বামীর রূপ-সুধা পান করিতে লাগিল; আবার লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল, সে চাহিয়া দেখিল, একখানি স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছে,—লক্ষ্মীন্দর বলিল,"দেখ, আমার বড় ক্ষুধা-বোধ হইতেছে, আমায় যদি চারটি ভাত রাঁধিয়া দিতে পার!"

এই বলিয়া লক্ষ্মীন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেহুলা এত রাত্রে সেই গৃহে কেমন করিয়া ভাত রাঁধিবেন! বরণ-ডালায় শুভ ঘট ছিল, তিনটা নারিকেল দিয়া উনন প্রস্তুত করিলেন, সেই শুভ ঘট নারিকেলের জলে পূর্ণ করিয়া বরণডালার তণ্ডুল লইয়া তাহাতে পুরিলেন,—স্বীয় স্বর্ণ-খচিত পট্টবস্ত্রের আঁচল ছিঁড়িয়া উননে অগ্নি জ্বালিয়া বেহুলা ভাত রাঁধিতে লাগিলেন।

এ দিকে আকাশে এক নিবিড় মেঘ-গৃহে মনসাদেবী উপবিষ্ট হইয়া সর্পগণকে

স্মরণ করিলেন। সেই গৃহের শীর্ষে একটা প্রকাণ্ড উল্কা-শিখা পতাকার ন্যায় ঊর্দ্ধে দুলিতেছিল ; সর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্ব্বত্র ধক্‌ধক্ করিয়া জলিতেছিল। মনসার আহ্বানে দিক্‌দিগন্তর হইতে সর্পসমূহ তথায় ছুটিয়া আসিল,—তাহারা কেহ এক-শীর্ষ, কেহ বহু-শীর্ষ, কাহারও দেহ চক্রাকৃতি বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত, কাহারও শরীর শুধু স্বর্ণরেখাময়। বিড়ঙ্গিনী, তক্ষক, বঙ্গ-দাড়া, শঙ্কর, তালভঙ্গ, প্রভৃতি অসংখ্য সর্প তথায় উপস্থিত হইল, তাহাদের গতিতে মরুৎ মন্থর প্রতিপন্ন হইল, সংহারিকা শক্তি ও চাঞ্চল্যে বিদ্যুৎ পরাস্ত হইল।

লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিতে কে যাইবে, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্পকুল মাথা হেট করিল। একটা কোপন-স্বভাব রক্ত-চক্ষু সর্প বলিল, “সাতালী পর্ব্বতে যে সকল তরুমূল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার গন্ধ দূর

হইতে পাইয়া আমার হাঁপানি রোগ জন্মিয়াছে।” বিষদন্ত বিকাশ করিয়া ত্রিশীর্ষ মহিজঙ্গ বলিল, “ময়ূর ও নেউলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে কে? তাঁহাদের ভয়ে আমার মাতুল-ভ্রাতারা বহুপুরুষের বাসস্থান সাতালী ছাড়িয়া নীল-গিরিতে আশ্রয় লইয়াছে।” দংশক সর্প রোষাবিষ্ট চক্ষু আবর্ত্তন করিয়া বলিল, “চাঁদ-সদাগর জগতের যত রোঝা সাতালী পর্ব্বতে জড় করিয়াছে, তাহারা যেথানে গর্ত্ত পায়, সেইখানেই মন্ত্র পড়ে ও তরুমূল নিক্ষেপ করে, অহিকুল গর্ত্তের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লৌহ-গৃহের একটা ছিদ্র আছে, কিন্তু যে সকল শান্ত্রী পাহারা দিতেছে, তাহারা এক এক জন চণ্ডু ও আফিম এক এক ভরি এক এক বারে খাইয়া চক্ষু এমন রক্তবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাদিগকে দেখিলে আমাদেরই ভয় হয়, তাহাদের দাঁতে যে বিষ জমিয়াছে,

তাহাতে আমাদেরই মৃত্যু হইতে পারে, অন্ততঃ আমাদের বিষে তাহাদের কিছু হইবার নয়। তাহারা মাথা নিচু করিয়া না কামড়াইলেও তাহাদের সঙ্গিনের খোঁচা খাইলে আমরা বাঁচিব না।”

মনসাদেবী পুনর্ব্বার বলিলেন—“আমি এ সকল ভীরুর বাক্য-কৌশল শুনিতে চাহি না, অহি-কুলে কি এমন কেহ নাই যে সমস্ত বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষ্মীন্দরের বাসর-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে দংশন করে? যে সকল বিপদ্ পথে আছে, তাহা সকলেই অবগত, অশক্তগণের মুখে তাহা আমি শুনিতে চাহিনা। যে বিপদে নির্ভীক সেই অগ্রসর হউক।”

তখন ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ-সর্প অগ্রসর হইল এবং নীরবে দেবীর প্রসাদ-চিহ্ন পাণে মাথা ঠেকাইয়া সাতালী-পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিল।

তখন বেহুলা-সতী অন্ন রন্ধন করিতে-ছিলেন ; সেই কাল-রাত্রিতে চারিদিক্ হইতে কি একটা শব্দ শুনা যাইতেছিল, চাঁদবেণে গৃহের চারিদিক্ ঘুরিয়া মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, একি তাহারই প্রতিধ্বনি ? সহসা বেহুলা দেখিলেন, লৌহের দেয়ালের একটা স্থানের লৌহপিণ্ড টুটিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে লৌহচূর্ণ খসিয়া পড়িতেছে, বলা বাহুল্য সে গুলি কয়লার গুঁড়া। সেই ছিদ্র-পথে ফণাবিস্তার করিয়া বঙ্করাজ প্রবেশ করিল। বেহুলা সোণার বাটীতে কাঁচা দুগ্ধ ও রামরম্ভা রাখিয়া সেই সর্পের সম্মুখে ধারণ করিলেন, আহারের লোভে বঙ্করাজ মাথা হেট করিয়া বাটীতে মুখ-প্রবেশ করাইল—বেহুলা সোণার সাঁড়াসি-দ্বারা তদবস্থায় সর্পকে বন্দী করিয়া ফেলি-লেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে কালদন্ত সর্প এবং

তৃতীয় প্রহর রাত্রে উদয়-কাল সর্প সেই ভাবেই বন্দী হইল,—শেষরাত্রে বেহুলা লক্ষীন্দরকে ভাত খাইতে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষীন্দর গভীর নিদ্রাভিভূত, কোন সাড়া দিলেন না।

সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা ও শ্রমে উপবাসী বেহুলা ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বন্দী সর্পত্রয়কে একটা বৃহৎ পাত্রদ্বারা চাপা রাখিয়া, বেহুলা স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, এক একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি সেই রন্ধ্রপথের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং ঘুমে হেলিয়া পড়িতেছেন ;—এমন সময় বায়ু-গতি কালনাগিনী মনসাদেবীর তাড়া খাইয়া রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল,—সেই গৃহপ্রবেশ কালে হঠাৎ "কে ও"—স্বরে কালনাগিনীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—ক্ষণকাল সে নড়িল না। কে জানে কেন বিনিদ্র

চাঁদ সেই সময়ে কোন্ গূঢ় অনিষ্টের আশঙ্কায় "কেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

কিছুকাল নিশ্চল থাকিয়া কালনাগিনী আবার চলিল, তখন বেহুলা ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া স্বামীর পদ-পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নিদ্রিত-ললাটে একটা দুশ্চিন্তার রেখা জাগিয়া আছে।

দ্রুত-গতিতে কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল, এই সময়ে নিদ্রাবেশে পাশ ফিরিতে যাইয়া নখার পদ সর্পের দেহে আঘাত করিল, অমনই কালনাগিনী উদ্যত-ফণা হইয়া তাহাকে দংশন করিল, লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"জাগ ওহে বেহুলা সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি?"

বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী দ্রুতগতিতে রন্ধ্র পথে

নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—অমনি কাটারি দ্বারা তাহার অষ্টাঙ্গুলী প্রমাণ পুচ্ছ বেহুলা কাটিয়া ফেলিলেন,—পুচ্ছহীনা কালনাগিনী তড়িৎ-গতিতে পলাইয়া গেল।

তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে; সনকা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য সাতালী-পর্ব্বতে হৈমবতীর ন্যায় আশীষ-হস্তে দণ্ডায়মানা, ত্রিশূলধারী মহাদেবের ন্যায় সেই দ্বারদেশে হিন্তালের যষ্টি হস্তে ভানুকিরণোজ্জ্বল উন্নত-কায় চন্দ্রধর চিত্র-পটের ন্যায় স্থির। রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে;—চন্দ্রধর ভাবিতেছেন বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার বক্ষ কেন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, নেত্রদ্বয় কেন ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে?

(৬)

এমন সময়ে সনকা সেই গৃহ মধ্যে অস্ফুট রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ব্যাকুলা হই-

লেন, তাঁহার সঙ্গিনীগণ দ্বারে আঘাত করিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল,—বেহুলা কাল-নাগিনীকে অনুসরণ করিয়া একবার দ্বার খুলিয়াছিলেন, তাহা আর বন্ধ করেন নাই। সকলে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামীর শব ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আলুলায়িত কুন্তলে সিন্দূর-রঞ্জিত কপালে দেবীর ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছেন; তিনি যে অস্ফুট স্বরে রোদন করিতে ছিলেন,তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করাতে সে রোদন থামিয়া গিয়াছে, কেবল সাক্ষী স্বরূপ একটি উজ্জ্বল অশ্রু গণ্ডের অর্দ্ধ-পথে লগ্ন হইয়া আছে। সনকার সঙ্গিনী-গণ বেহুলাকে গালি দিতে লাগিল। "খণ্ড-কপালিনী বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামীর জীবন নাশ করিলি। তোর সীঁথির প্রথম সিন্দূর বিন্দু ঘোচে নাই, পট্টবস্ত্র মলিন হয় নাই,পদের আলতায় এখনও ধূলি পড়ে নাই, বাসর রাত্রেই বংশের দীপ নিবাইলি।"

"খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরুনী দাঁতী
বিহাদিনে খালি পতি না পোহাতে রাতি"

সনকা পুত্রের বিবর্ণ, বিষজর্জ্জরিত মুখমণ্ডল দেখিয়া কর্ত্তিত তরুর ন্যায় সেই স্থানে নিপতিত হইলেন। চাঁদ সেই স্থান হইতে ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেহুলা রমণীগণের নিন্দা শোনেন নাই, তাঁহার মন সে দিকে ছিল না, জন্মের তরে স্বামী একটিবার আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন,—জন্মের তরে একটিবার তাহার হাতের রাঁধা ভাত খাইতে চাহিয়াছিলেন, বেহুলা তাহাও দিতে পারেন নাই, সেই কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। রমণীগণ সত্যই বলিয়াছে সে ত খণ্ডকপালিনী ও চিরুনী দাঁতী, তাহা না হইলে এরূপ পোড়া-অদৃষ্ট কাহার হয়, বিবাহের রাত্রে স্বামীর মৃত্যু কাহার হইয়া থাকে! বেহুলার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে উদ্যত হইল, তিনি তাহা নিরোধ করিলেন।

একবার মাত্র চক্ষু তুলিয়া বেহুলা দেখিলেন, প্রৌঢ়া স্নেহ-বিহ্বলা মূর্চ্ছিতা সনকা কিন্নরীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছেন,এমন শ্বাশুড়ীকে লইয়া তিনি আয়ত-চিহ্ন ধারণ করিয়া এক-দিনও সংসার করিতে পারিলেন না!

"পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।
জ্ঞাতিগণ ধরে নিল গাঙ্গুড়ের কূল।"

বেহুলার আজ কোন লজ্জা নাই, তিনি স্বামীর শবের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। লখার জন্য পদ্ম-গন্ধী কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত হইল,— বেহুলা সেই চিতার পার্শ্বে যাইয়া বলিলেন, "যদি ইহাঁকে পুড়াইবে, তবে আমি ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে চিতায় প্রবেশ করিব। কিন্তু ইহাঁকে পুড়াইয়া কাজ নাই, সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে পুড়া-ইবার নিয়ম নাই, ইহাকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দাও, কি জানি যদি কোন রোঝার কৃপায় ইনি প্রাণ পাইতে পারেন। আর সেই ভেলায় আমি ইহার সঙ্গে যাইব।"

সকলে বেহুলার কথা অনুমোদন করিল, বেহুলার সঙ্গে যাওয়ার কথাটা একটা কথার কথা মনে করিয়া কেহ সে সম্বন্ধে কিছু বলিল না।

কিন্তু যখন ভেলা প্রস্তুত হইয়া গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিল; শব সেই ভেলায় রক্ষিত হইল, তখন পট্টাম্বর-ধারিণী সিন্দূরচন্দন-লিপ্ত ললাটা সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা সেই ভেলায় যাইয়া বসিলেন। সকলে দেখিয়া 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিল। যাহারা 'খণ্ডকপালিনী' 'চিরুনীদাঁতি' বলিয়া বেহুলাকে কত গালি দিয়াছিল, তাহারা আসিয়া হাতে ধরিয়া সাধিতে লাগিল। এমন বুদ্ধিশূন্যা বালিকা ত কেহ কখন দেখে নাই, বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যাহারই স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহা-রাই ত বিধবা হইয়া গৃহে বাস করে, মৃত স্বামীকে বাঁচাইবে, এমন কথা কে শুনিয়াছে? তাহারা ধারাকুলনেত্রে বেহুলার পদ্মনাল-

তুল্য কোমল কর ধরিয়া কত অনুনয় জানা-ইল,—কিন্তু বেহুলা গাঙ্গুড়ের জলে নিশ্চল হইয়া ভেলায় বসিয়া রহিলেন। শোকে উন্মাদিনী ধূলি-ধূসরিত সনকা কাঁদিতে কাঁদিতে গাঙ্গুড়ের কূলে আসিয়া বলিলেন—"হতভাগিনী শ্বশুর-বাড়ীতে উপবাস করিয়া আসিয়াছিলে, এখানে এক বেলা একমুষ্টি ভাত খাইলে না, চল মা আমার লখার শোক তোমার মুখ দেখিয়া জুড়াইতে চেষ্টা করিব।" কিন্তু বেহুলা সেই ভেলা হইতে নড়িলেন না।

তখন অপরাহ্ণ,—চম্পক-নগরের লোক গাঙ্গুড়ের কূলে ধরে না, লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তাহাদের চক্ষু অশ্রুভারা-ক্রান্ত ও গদ্‌গদ কণ্ঠ; তাহারা বলিতেছে,"বুদ্ধিহীনা তরুণী জননী, আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার স্বামী নাই, কিন্তু চম্পকবাসী আমরা তোমার সন্তান. আমাদিগকে

ছাড়িয়া যাইও না।”সনকা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতেছেন, “আমার সাবিত্রী, ঘরে ফিরিয়া এস, আমি লখার শোক তোমাকে দেখিয়া ভুলিব।” গ্রামান্তর হইতে দেশ-বিদেশ হইতে লোকেরা আসিয়া দেখিতেছে— স্বামীর শবের পার্শ্বে স্থিরসৌদামিনীর মত সাধ্বী বসিয়া আছেন, গাঙ্গুড়ের জলে ভেলা ভাসিয়া যাইতেছে, লোকে বলিতেছে, “আমরা সীতা সাবিত্রীর কথা পুরাণে শুনিয়াছি। ঐ দেখ, তাঁহাদের একজন চম্পকনগরে প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।”

গাঙ্গুড়ের তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া ভাসিয়া ভেলাখানি যাইতেছে, বেহুলা ভাবিতেছেন, যে দেশে মৃত্যু নাই সেই দেশ হইতে তিনি স্বামীর জীবন আনয়ন করিবেন।

শোকোন্মত্তা মাতা সনকা কোন ক্রমেই নদীতীর ছাড়েন না, ধূলায় পড়িয়া আছাড়ি বিছাড়ি খাইতে লাগিলেন। বেহুলা ডাকিয়া

বলিলেন, "বাসর ঘরে কড়ার তেলে দীপ জ্বলিতেছে, সেই কক্ষটি অর্গল-বদ্ধ করিয়া রাখিবেন। আমার স্বামীর প্রাণ উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিব সে দীপ নিবে নাই। বাসর ঘরে হেম থালায় যে ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছি, তাহা দাড়িম-গাছের নীচে পুতিয়া রাখিবেন।" চারিদিক্ হইতে শোকার্ত্ত শত শত নর-নারী বেহুলাকে ডাকিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, "মা তোমার মুখ দেখিয়া আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে,—অভাগিনী মা ফিরিয়া এস।" বেহুলা সজলনেত্রে যুক্ত-করে এই মাত্র বলিলেন,—"তোমরা আশীর্ব্বাদ করিও যেন আমি স্বামীর জীবন লাভ করিতে পারি।"

বলিতে বলিতে বেহুলা, শব ও ভেলা নদীর তরঙ্গে সুদূরে চলিয়া গেল।

এই মহাশোক-কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। একাকিনী অবোধ বালিকা মকর-

কুম্ভীরসঙ্কুল নদীতরঙ্গে স্বামীর শব লইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। যাহারা এ দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহারা এ কথা কাঁদিতে কাঁদিতে অপর সকলকে বলিল; যাহারা শুনিল, তাহারাও কাঁদিয়া আকুল হইল। চম্পকনগরবাসীরা সেই গাঙ্গুড়-নদীর জল গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্র মনে করিল,—এই নদী দিয়া সতীলক্ষ্মী ভাসিয়া গিয়াছেন, সেই নদীর তীরের মৃত্তিকা তাহারা পবিত্র জ্ঞানে পুঁটুলিতে বাঁধিয়া দেব-বিগ্রহের সঙ্গে এক স্থানে রাখিয়া দিল।

সনকা নখা ও পুত্র-বধূর কথা মনে করিয়া দিন রাত্রি মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সদাগরও গৃহে একটিবার পদার্পণ করেন না। সকলে বলিত, সদাগর পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে সনকা এ কথা শুনিলে আবার মূর্চ্ছিতা হইতেন।

৭

কিন্তু সদাগর পাগল হন নাই। রক্তপট্ট-বস্ত্র পরিয়া রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিয়া সদাগর সাতালী-পর্ব্বতের বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। সন্ধ্যাকালে যখন পর্ব্বতের বন্ধুর শীর্ষভেদ করিয়া ছিন্ন ছিন্ন মেঘপংক্তি উড্ডীন হইত, তখন তিনি মনে করিতেন, উহা ত্র্যম্বকের বিশাল জটাজূট। গাঙ্গুড় নদীর তরঙ্গাভিহত পাহাড়ের পাদমূল দেখিয়া তাঁহার মনে হইত, বিরাট নগ্নকায় মহেশ্বরের জটা হইতে শুভ্র গঙ্গাধারা অবতরণ করিতেছে। কখনও বাপীনীরে ফুল্লারবিন্দ-দর্শনে তিনি মনে করিতেন, হরের ত্রিনেত্র জলে স্থলে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কখনও নিশাকালে পর্ব্বতের শীর্ষ হইতে শশি-লেখা উদিত দেখিয়া তিনি জটাজূটমণ্ডিত চন্দ্রচূড়-ভ্রমে সেই গিরিকে অসংখ্যবার প্রণিপাত করিতেন।

নিশাশেষে ম্লান নক্ষত্র-পংক্তি সেই পাহাড়-শীর্ষ বেষ্টন করিয়া শোভা পাইত, কখনও তিনি তাহাদিগকে হরাঙ্গশোভী রুদ্রাক্ষ মনে করিতেন, কখনও বা শিবদেহের শুভ্র ভস্ম-চিহ্ন ভাবিয়া ভক্তি-গদগদ্‌কণ্ঠে শঙ্করস্তব-মালা পাঠ করিতেন, কখনও বা গাঙ্গুড়ের অস্ফুট শব্দে চমৎকৃত হইয়া তিনি তন্মধ্যে হর-মুখোচ্চারিত "ওঁ কারে"র আভাষ পাইতেন। দিনরাত্র তিনি এই ভাবে শিব-ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন।

শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে হইত, যেন "আমার নখা কোথায়?" বলিয়া কেহ চীৎকার করিতেছে;—সেই তীব্র চীৎকার করিয়া যেন কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আর কথা না বলিতে পারিয়া শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রাণভেদী যাতনায় ছটফট্‌ করিতেছে, বেপথুমান সদাগর সেই আর্ত্তস্বর ও নিশ্বাস-পতনশব্দ-কল্পনায় বিচলিত হইয়া

স্বগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন ;—তখন তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিত।

কখনও শিবমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিতেন, যেন কোন উন্মাদিনী রমণী প্রাণ-প্রতিম কাহাকেও বক্ষে লইয়া অকূল নদী-তরঙ্গে ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে; 'ইহারা কে'—সদাগরের তাহা নির্ণয় করিতে মুহূর্ত্ত-কাল চলিয়া যাইত, সেই মুহূর্ত্ত পরে আবার তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অজস্র অশ্রু পতিত হইত। পুনরায় আত্মস্থ হইয়া সদাগর শঙ্কর-স্তব পাঠ করিতেন, তখন উচ্চ-কণ্ঠোচ্চারিত 'হর' 'হর' শব্দে সেই পাহাড় কাঁপিয়া উঠিত।

৮

এ দিকে নিছনি-নগরে সংবাদ পৌঁছিল, গাঙ্গুড়-নদীতে বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে। সায় বেণের বাড়ীতে এ কথা

কেহ বলিল না ; কিন্তু অমলার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহে বসিয়া একটা কাক কর্কশ-কণ্ঠে ডাকিতে থাকে, অমলা মনে ভাবেন, কাক কি দুঃখের কথা বলিতেছে ; বেহুলার কথা মনে হইলে দর-বিগলিত ধারায় তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া যায়। "তবে কি আমার বেহুলার কোনও অমঙ্গল হইল ?"

কিন্তু একদিন কে বলিয়া গেল, "বেহুলার সংবাদ ভাল নহে, তোমরা লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লও।" এই কথায় অমলা উতলা হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হরি-সাধু তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা সুবল ও শ্রীরাম সাধুকে লইয়া চম্পক-নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বিবিধ মিষ্টান্ন, বিচিত্র পরিচ্ছদ ও অপরাপর উপঢৌকন লইয়া গাঙ্গুড়ের তীর-পথে যাইতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে শত শত লোক বলিতে লাগিল, "তোমাদের সাধের

কাঞ্চন-প্রতিমা বেহুলা মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে।”

শুনিয়া তিন ভ্রাতার মস্তকে যেন বজ্র-পাত হইল। তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিতে পাইলেন, সজলনয়না বেহুলা কলার মান্দাসে বসিয়া মৃত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ভেলা একবার জলে ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে; উপবাস-শীর্ণা-শোকময়ীর সে দিকে দৃক্‌পাত নাই; তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু,—আর্দ্র বসনখানি বায়ুহিল্লোলে উড়িতেছে। চারি-দিক হইতে কত কুমীর সেই মৃতদেহ গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, বেহুলার কর-সঞ্চালিত জলহিল্লোলে তাহারা দূরে সরিয়া যাইতেছে, অবিরল অশ্রুজলে বেহুলার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইতেছে।

হরি-সাধু ডাকিয়া বলিলেন, “ভগিনী, তোমার এ দশা কেন? অপ্সরার ন্যায় এত

সাজ-সজ্জা করিয়া দুই দিন হইল তোমাকে পতিগৃহে পাঠাইয়াছিলাম, তোমার এ দশা কে করিল?" বলিতে বলিতে হরি সাধু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

বেহুলা কথা না কহিয়া শুধু কপালে হাত দিয়া দেখাইলেন; শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার দুটি চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাষ্প গদ্গদকণ্ঠে হরি-সাধু বলিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, এখন লখাইকে লইয়া ভেলা এইখানে লাগাও; অগুরু ও চন্দন-কাষ্ঠের চিতায় সযত্নে লখাইএর সৎকার করিব। শব লইয়া জলে ভাসিবার তাৎপর্য্য কি? বুদ্ধিহীন চাঁদ-সদাগর মৃতের সঙ্গে জীবিতকেও জলে ভাসাইয়া দিয়াছে, চম্পকনগরের লোক কি নির্ম্মম! তোমাকে জীবন থাকিতে আমরা আর সেখানে যাইতে দিব না।"

বেহুলা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল,

"এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে পারিলে দেশে ফিরিয়া আসিব, স্বামীর যে গতি, আমারও তাহাই।"

তীরের লোকেরা বেহুলার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরি সাধু পুনরায় বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া এস, ঘরের প্রধানা হইয়া থাকিবে। তুমি মাতার নয়ন-পুত্তলী,—সাত নহ, পাঁচ নহ, আমাদের বড় যত্নের একমাত্র ভগিনী, তোমাকে শাঁখা পরাইতে পারিব না, কিন্তু মূল্যবান্ সুবর্ণের চুড়ী পরাইব, সিন্দূরের পরিবর্ত্তে কপালে ফাগের গুঁড়া পরিবে, মৎস্য মাংস ছাড়িবে, কিন্তু অপর নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য তোমাকে আমরা দিব,—ভেলায় অকূলে ঝাঁপ দিয়াছ, এখনই হাঙ্গর কুমীরে তোমাকে খাইয়া ফেলিবে, পথে দুষ্ট লোকে তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে,—তুমি নিরুপমা সুন্দরী।"

বেহুলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দাদা! তোমরা ফিরিয়া যাও,—আমি নিরামিষ হাঁড়ি প্রতিদিন ফেলিবার জন্য তোমাদের গৃহে যাইতে পারিব না। মাকে বলিও, যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার সঙ্গেই আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না। চাঁপাগাছের নীচে ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য পুঁতিয়া রাখ, যদি স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাই, তবে আমরা আসিয়া খাইব। তীরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন?" বেহুলার চক্ষে পুনরায় টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ভেলা সে স্থান অতিক্রম করিয়া গেল।

ও কে যায়! গাঙ্গুড়ের জলে ভেলায় ভাসিয়া মৃত স্বামীকে অঙ্কে রাখিয়া কে যায়! জীবন-সঙ্গিনী অনেক দেখিয়াছ, মরণ-সঙ্গিনীকে একবার দেখ। সধবার

মাথায় সিন্দুর অনেক দেখিয়াছ, বিধবার মাথার সিন্দুর দেখিয়া যাও। এই ঘোর নদী-জল—প্রভাতের তরুণ সূর্য্য সেই সিন্দুর-বিন্দু উজ্জ্বল করিতেছে—এই ঘোর নদীজল,—সন্ধ্যার আঁধারে নক্ষত্রের ম্লান-জ্যোতিতে বেহুলার দেহ উদ্ভাসিত হইতেছে।

বাঘের বাঁকে পৌঁছিয়া শব পচিতে আরম্ভ করিল; সেই সুন্দর দেহ গলিত হইয়া গেল; কৃমি কীটে তাহা বেড়িয়া ধরিল। বেহুলা এক মনে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই কৃমি কীট ছাড়াইতে থাকিতেন, এবং নদী-তীরে যেখানে মনসার মন্দির পাইতেন, সেইখানে পূজা দিয়া আসিতেন,—পূজার উপকরণ শুধু নয়নজল।

গোদার ঘাটে এক কৈবর্ত্ত মাছ ধরিত; তাহার দুই পায়ে গোদ, দুই কাণে রামকড়ি ও গলায় শঙ্খের মালা; আসে পাশে জালের

দড়ি ও বঁড়শী; সে বেহুলার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল,—তাহার ঘরে চার পত্নী, তাহারা খাসা গুয়া ও সাঁচিপাণ খাইয়া সুখে ঘর করিত। গোদা বেহুলাকে প্রধানা পত্নী করিবে—এই ভরসা দিয়া আহ্বান করিল। বেহুলা মান্দাসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া গোদা তাহাকে ধরিবার জন্য নদী-জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু বেহুলার দৃষ্টিমাত্র একটা প্রবল তরঙ্গ গোদাকে কোন্ দিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল!

নৌকা বাহিয়া ধনা মনা ভ্রাতৃদ্বয় যাইতেছিল। তাহারা উভয়ে বেহুলাকে দেখিয়া পাগল হইল; কে বেহুলাকে লইবে, এই কথায় তর্ক করিয়া দুই জনে ঘোর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল! নৌকার উপর মারামারি করিয়া তাহারা নৌকা-সহ উল্টিয়া জলে পড়িয়া গেল।

এক বৈদ্য-রাজ লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ উদ্ধার

করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন ; বেহুলা তাহার অশিষ্ট চক্ষুভঙ্গী দেখিয়া মান্দাসে ভাসিয়া চলিয়া গেলেন,—এই অবস্থায়ও লোকের রহস্যের ইচ্ছা হয় ভাবিয়া তাঁহার দুই চক্ষে অবিরত জল পড়িতে লাগিল, এবং সেই গলিত শব হইতে দিবারাত্রি মাছি তাড়াইয়া বেহুলা দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শবে মাছিতা পড়িল। এক জায়গায় মাছিতা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে অপর জায়গায় মাছিতা পড়া আরম্ভ হয়, এবং মাংস ক্রমাগত পচিয়া জলে পড়িতে লাগিল।

এই পূতি-গন্ধ শব লইয়া বেহুলা কোথায় যাইতেছেন, তিনি তাহা জানিতেন না। যে তপস্যায় পুনর্জীবন দেওয়া যায়, তাঁহার হৃদয়ে সেই তপস্যার সঞ্চয় হইতেছিল। কে কি ভাবে কোথা হইতে তাঁহার স্বামীর জীবন দিবেন, তিনি জানিতেন না ; কিন্তু যতই কষ্ট সহিতে লাগিলেন, ততই মনে

হইতে লাগিল, কেহ অভয়-বাণী দিতে আসিতেছেন। তিনি যত দুঃখ সহ্য করিতেছেন, তাহা অন্তর্যামী দেবতা জানেন,—তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না।

এই সময় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ভেলাখানি একেবারে পচিয়া গেল, বাঁশগুলি খুলিতে আরম্ভ করিল। জলের উপর কি করিয়া থাকিবেন? গলিত শবকে বক্ষে জড়াইয়া এই বিপদে বেহুলা বিষহরি-দেবীকে স্মরণ করিলেন। আর এক জনের কথা মনে করিয়া তখন সহসা শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল,—যে মূর্ত্তি একবার দেখিয়া বেহুলা ভুলিতে পারেন নাই,—লক্ষ্মীন্দরের চন্দ্রমুখের আভাস যাঁহার প্রৌঢ়মুখে তিনি দেখিয়াছিলেন, আজ এই দুঃখের সময় কে জানে কেন সেই সনকাকে মনে পড়িতে লাগিল। এই সময় কে যেন সহসা

অদৃশ্যভাবে তাঁহার ভেলা নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়া গেল!—বেহুলা ডুবিবেন, এমন সময় দেখিলেন, পদ্মগন্ধি কদলী-তরুখণ্ডে ভেলা নূতন হইয়া গিয়াছে!

তিন চার দিন পরে বেহুলার ভেলা আসিয়া কোনও ঘাটে লাগে; তখন নানা খাদ্যদ্রব্য লইয়া গৃহস্থগণ আসিয়া তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করেন; বেহুলা স্নানান্তে সামান্য কিছু ফল খাইয়া দর্শকগণের নিকট যুক্তকরে কাঁদিয়া প্রার্থনা করেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীকে যেন বাঁচাইতে পারি।" স্বামী কোথায়? ঈষৎ-মাংসাবৃত গলিত-কঙ্কাল দেখিয়া সকলে অশ্রুবিগলিতচক্ষে বলেন, "আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাইবে।" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের গণ্ড নয়ন-জলে ভাসিয়া যায়।

ইহার মধ্যে একদিন—

"ধরিয়া মরার গায়ে হানে এক জোঁক।
দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায় বড় শোক॥
ছাড়াইলে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥
অবিরত অশ্রুজল নিবারিতে নারি।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলাসুন্দরী।"

সেইখানে—

"পথের পথিক যত পথ বেয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগতমোহিনী কেন মরা লৈয়া কোলে
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥"

৯

এই ভাবে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। লখাইএর কয়েকখানি হাড় মাত্র অবশিষ্ট; বেহুলা উপবাসে ও অকথ্য কষ্টে শীর্ণা বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছেন; এ আর সে "চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা"—প্রফুল্ল-মুখী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের ডালি বেহুলা

নহেন, তাঁহার মাতা অমলাও আর তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। ক্ষীণ-দেহ বাতাঘাতে তরঙ্গাঘাতে সতত ক্লিষ্ট। সে মুখের মধুর হাসি—যাহা নিছনি-নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুসুমতুল্য ছিল, তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, আছে শুধু জ্যোতিঃ—খর পুণ্যের জ্যোতিঃ – সাধুরা তাহা চিনিতে পারিতেন, সেই অতিক্ষীণ কান্তিতে একটা জ্বলন্ত সূর্য্যের প্রভা ছিল,—তাহা স্বর্গীয়।

প্রায় ছয় মাস অতীত হইতে চলিল। একদিন সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়াছে। নিবিড় অন্ধকার নদীবক্ষে বিকট তরঙ্গ আশ্রয় করিয়া যেন পৈশাচিক গান গাহি-তেছে। জলজন্তুরা ভেলার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। বেহুলা স্বামীর কঙ্কাল লইয়া চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া আছেন। বাতাস যেন কি উৎকট শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বেহুলা জলে কি স্থলে

আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; আকাশ কোন্ দিকে, নদী কোন্ দিকে, কোন দিক্ হইতে বাতাস বহিতেছে, আঁধার কোন দিক্ হইতে নামিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তারা নাই, চন্দ্র নাই, কোনও নৌকার দীপ-শিখাটি পর্য্যন্ত নাই, শুধু কে যেন ফণিরাজের ন্যায় তাঁহাকে বহন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে—এ কি নদী? এই নিবিড় রজনীতে বেহুলা শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে, "মৃত দেহ কি প্রাণ পায়!—বেহুলা! তুমি বাতুলতা ছাড়িয়া ঘরে যাও।" এই কথার পর চারি দিক্ হইতে একটা বিকট অট্টহাস্য হইল; বেহুলা নির্ভীকভাবে স্বামীর কঙ্কালকে দৃঢ়তর আলিঙ্গনে বক্ষে ধারণ করিলেন,—সেই বিকট-ধ্বনি থামিয়া গেল। সহসা মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে এক নাট্যশালার ন্যায় দৃশ্য বেহুলার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল,—অসংখ্য নরনারী

একত্র হইয়া আনন্দোৎসব করিতেছে। তাহাদের মধ্যে গন্ধর্ব্বের মত সুপুরুষগণ বেহুলাকে ডাকিয়া বলিতেছে,—“বেহুলা, ছি! মৃতের কঙ্কালটা ফেলিয়া এস, সুবাসিত জলে স্নান করিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা-পূর্ব্বক দিব্য পুষ্পমাল্য, নানা পরিচ্ছদ ও আভরণ পরিয়া এখানে এস,—রমণীর যৌবন অস্থায়ী, তাহা একবার গেলে নদীর স্রোতের ন্যায় আর ফিরিয়া আসিবে না, এস আমরা রসালাপে ও বিচিত্র সম্ভোগে জীবনযাপন করি।” বেহুলা দেখিলেন—তাহারা প্রত্যক্ষ, ইহা স্বপ্ন নহে, গন্ধর্ব্বযুবকগণের স্বর সুস্পষ্টভাবে কর্ণে আসিতেছে, তাহাদের রূপ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত;—বেহুলা ঘৃণায় চক্ষু মুদিত করিয়া কর্ণকুহর বন্ধ করিলেন, এবং লখাইএর কঙ্কালকে দৃঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া উহাই একমাত্র আশ্রয়ের ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করিলেন। গন্ধর্ব্বপুরী দেখিতে দেখিতে

অদৃশ্য হইল। তখন ভয়ানক শীত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে ও রোমরাজি জর্জ্জরিত হইতেছে, পঞ্চপ্রাণ শীতাধিক্যে শিহরিয়া উঠিতেছে; বাতাস শাণিত ছুরীর ন্যায় গাত্র বিদ্ধ করিতেছে। বেহুলা দেখিলেন, অতি সুকোমল উষ্ণ শয্যায় বসিয়া এক পরম রূপবান যুবক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। বেহুলা ঘৃণায় চক্ষু মুদিত করিলেন, এবং শীত নিবারণার্থ শীতল লখাইএর কঙ্কাল আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।—শীতের সঙ্গে সেই দৃশ্য তিরোহিত হইল।

সহসা বেহুলা শুনিলেন, ফেরু ও ব্যাঘ্রদল চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "ঐ হাড় কয়খানি দাও, আমরা চিবাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করি, উহা দ্বারা তোমার কোন কাজই হইবে না, তোমার দয়ার শরীর,—আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না।" বেহুলা

সভয়ে কঙ্কালগুলি বক্ষে রাখিয়া স্বীয় শীর্ণ শরীর দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া ভেলায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ব্যাঘ্র ও ফেরুপাল চলিয়া গেল।

তৃতীয় প্রহর রাত্রে বেহুলা তাঁহার মাতা অমলাকে দেখিতে পাইলেন। শরীর ক্ষীণ, ধূলি-লুণ্ঠিত, চক্ষে দর দর বারিধারা, "আমার নয়ন-মণি বেহুলা আয়,—নিছনিগ্রামে তোর পিতা সায়-সদাগরের দশা দেখিয়া যা"—বলিয়া হতভাগিনী চীৎকার করিতেছে; গাঙ্গুড়ের জলে কোন ভেলা দেখিলে পাগলিনীর ন্যায় অমলা তাহা ধরিতে যায়,—চম্পক-নগরের কোন লোক আসিলে তাহার পদতলে পড়িয়া মাথা কুটিতে থাকে। কদলী বৃক্ষ দেখিলে শিহরিত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়; কেবল বলে, "আমার বেহুলা! বক্ষে আয়" অনশনে ও হা হুতাশ করিয়া তাঁহার সোনার অঙ্গ ম্লান হইয়া গিয়াছে, যাঁহার জন্য

বিশ্বের লোক ঝুরিয়া মরিতেছে—তাঁহার হতভাগিনী মাতা কি করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে?—"একবার আমার গৃহের রাণী গৃহে আয়" বলিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া অমলা আসিয়া বেহুলার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত। "মৃতদেহে কে কবে জীবন দিয়াছে! আমার দেহে জীবন থাকে না,—একবার জীবন দিয়া যাও" বলিয়া অমলা তাহাকে ধরিতে আসিলেন। মাতাকে দেখিয়া বেহুলার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল,—"মা! আমি যাব না, আমি যেতে পারিব না," বলিয়া বেহুলা সেই কঙ্কালগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অমলা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

তখন বেহুলা 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে-ছেন,—কে মা কোথায় আছ, অনাথিনীকে ধর, দেখ আমার হাতে বল নাই, পায়ে বল

নাই, দেহে বল নাই ; আমার বড় কষ্টের ধন স্বামীর দেহাবশেষ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না ; আমার দেহের ছিন্ন পট্ট-বস্ত্র উড়িয়া গলিয়া গেল, মা আমি লজ্জা রক্ষা করিতে পারিলাম না, আমি বড় দুঃখ সহিয়াছি মা—তুমি যদি দুঃখ দাও, কে তাহা ঘুচাইবে ;—আমি সেই দুঃখকে মাথায় করিয়া লইলাম—আমার বল, সাহস কিছুই নাই—মা বিষহরি ! দীন দুহিতাকে কোলে তুলিয়া লও।”

তখন অপূর্ব্বরূপচ্ছটায় আকাশের পূর্ব্ব-প্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; কে যেন বেহুলার হস্তে এক অমৃত ভাণ্ড আনিয়া দিল! সেই অমৃত-ভাণ্ড হস্তে করিয়া বেহুলার নষ্ট রূপ ফিরিয়া আসিল, তাঁহার ছিন্ন পট্ট-বস্ত্র নবশ্রী শোভিত হইল, বেহুলার হৃদয়ে অপূর্ব্ব সাহস হইল। তিনি অন্তরের অন্তর হইতে বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী বাঁচিয়া উঠি-

বেন। কে বুঝাইল, কি ভাবে বুঝিলেন, বেহুলা তাহা জানিলেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন।

সহসা বেহুলার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে পড়িল। তিনি দেখিলেন, গত সাত জন্ম তিনি চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অরুণোজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিয়া দিব্য সিন্দূর-রাগ-দীপ্ত ললাটে তিনি স্বামীর সঙ্গে সাতবার দগ্ধ হইয়াছেন। প্রতিবারেই তিনি বিবাহের রাত্রে স্বামীকে হারাইয়াছেন, সুখের সংসার পাতিবেন বলিয়া বিবাহের রাত্রে কত আনন্দ! সেই রাত্রেই বিধবা হইয়া পরদিন স্বামীর সঙ্গে চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন। সেই পুণ্যে এ জন্মে তিনি স্বামীকে ছাড়েন নাই, স্বামি-লাভের জন্য সেই পুণ্যে তিনি মৃত্যুর দ্বারদেশে আসিতে সাহস করিয়াছেন। এবার তিনি স্বামীকে পাইবেন, প্রতিবাদী বিধাতা এবার তাঁহার সুকঠোর তপস্যায়

প্রীত হইয়াছেন। বেহুলা যেন নখাগ্রে অতীত জন্মের দৃশ্যগুলি দেখিলেন।

১০

উৎকট রজনী প্রভাত হইয়া গেল। বেহুলা দেখিলেন, নেতা ধোপানী ঘাটে কাপড় কাচিতেছে। বেহুলার ভেলা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই ঘাটে লাগিল।

নেতা ধোপানীকে দেখিয়া বেহুলার বোধ হইল, এ রমণী শরীরধারী হইলেও অশরীরী কোনও দেবী।

বেহুলা ভাবিলেন, যে দেশে মৃত্যু নাই, এ রমণী সেই সন্ধান জানে ; নতুবা ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় এরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে কেন ?

সমস্ত দিন বেহুলা ঘাটে ভেলা লাগাইয়া নেতা ধোপানীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নেতা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

প্রাতে নেতার একটা দুষ্ট বালক কাপড়

কাচিবার সময় তাহাকে বিরক্ত করাতে সে গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া কাপড় কাচিবার পাটার পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

সে দিকে আর সে দৃষ্টিপাতও করে নাই ; সমস্ত দিন কাপড় কাচিয়াছে, তাহার পিটু-নিতে কাপড়গুলি অমল শশধরের ন্যায় ধবল উজ্জ্বল হইয়াছে! বেহুলা তেমন শুভ্র যূথিকা-তুল্য ধৌত বসন আর দেখে নাই।

সন্ধ্যাবেলা সেই মৃত শিশুটির অঙ্গে কয়েক বিন্দু জল ছড়াইয়া নেতা তাহাকে বাঁচাইল! বালক নিদ্রোত্থিতের ন্যায় মুখে এক রাশি হাসি লইয়া উঠিল।

তখন লীলাময়ী নেতা কাপড়ের স্তূপ মাথায় লইয়া এক হস্তে বালকের কর-ধারণ-পূর্ব্বক উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল! ক্ষণকালের মধ্যে অপূর্ব্ব রূপের হিল্লোল তুলিয়া নেতা বায়ু-পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। তড়িৎ যেমন

করিয়া চলিয়া যায়, নেতা ধোপানী সেই ভাবে চলিয়া গেল।

বেহুলা সারারাত্রি ভেলায় বসিয়া ভাবিলেন,—'এ কি স্বপ্ন দেখিলাম?'

পরদিন ঘাটে আবার নেতা ধোপানী উপস্থিত হইল। বালকটিকে পূর্ব্ব দিনের মত সে মারিয়া শোওয়াইয়া রাখিল, এবং সন্ধ্যাকালে কাপড় কাচা শেষ করিয়া পূর্ব্ববৎ তাহাকে প্রাণদান করিল। কিন্তু যখন যূথিকা-শুভ্র বস্ত্র নিবিড় মেঘোপম কৃষ্ণকেশ-গুচ্ছের উপর স্থাপন করিয়া এক হস্তে বালকের করধারণ পূর্ব্বক অপর হস্তে জানু-নিম্নাবলম্বী পরিধেয় শাড়ীর অঞ্চল আকুঞ্চিত করিয়া রূপ-লতা আকাশে উথিত হইবে, সেই সময় বেহুলা একটা ছিন্নবৃন্ত ফুলের ন্যায় তাঁহার পাদমূলে যাইয়া পড়িলেন।

নেতা সরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"এমন স্বামি-পাগলা মেয়ে ত

কোথাও দেখি নাই, স্বামী বাঁচাইবে ত আমার সঙ্গে স্বর্গে চল, মহেশ্বর তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।”

এত শীঘ্র যে নেতা ধোপানী এমন অমৃত-তুল্য কথা বলিবে, বেহুলা তাহা জানিতেন না; বেহুলার চক্ষু দিয়া দর দর জল পড়িতে লাগিল। নেতা আদরে তাঁহার চক্ষুজল মোছাইয়া নানা স্নেহ-মধুর কথা বলিলেন, যেন তিনি বেহুলার কত দিনের পরিচিত, কত অন্তরঙ্গ,—সেই স্নেহ পাইয়া বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু-গঙ্গা ছুটিল, বেহুলার প্রতি-অশ্রুবিন্দুতে নেতা তাহার কষ্টের কথার ইতিহাস বুঝিতে পারিলেন।

স্বর্গে দেব-সভায় নেতা বেহুলাকে লইয়া গেলেন। সেখানে সূর্য্যতুল্য এক উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, অম্লান পারিজাত কুসুমের মাল্য-কণ্ঠে ইন্দ্র বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সহস্র চক্ষু নিষ্পন্দ হইয়া বেহুলার

উপর পতিত হইল। ইন্দ্রের সিংহাসন হইতে উর্দ্ধে রক্তবর্ণ পট্ট-বস্ত্র-পরিহিত, রক্তমাণিকের হার কণ্ঠে, রক্ত উত্তরীয়-শোভিত, রক্ত-বর্ণ-দেহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যোগীবরের ন্যায় হংস-রথে আরূঢ় ছিলেন, তাঁহার অষ্টচক্ষু কৌতূহল-পরবশ হইয়া বেহুলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তদূর্দ্ধে কৈলাসের রত্নময় মণি-প্রসাদ, তাহার কক্ষে কক্ষে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডার রক্ষিত, কুবের সেই ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক ; স্বয়ং অন্নপূর্ণা স্বর্ণ থালায় বিশ্বের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য অমৃত-তুল্য খাদ্য পরিবেশনে নিযুক্ত। এত ধন,—এত দৌলত, এরূপ মণিময় পূরী যাঁর—না জানি তাঁহার যান-বাহনের কি ঘটা, কিন্তু এ কি! গৃহ-স্বামী দিগম্বর, ভাঙ্গ-ধুতরা খান, শ্মশানের চিতায় শুইয়া থাকেন, ছাই ভস্ম মাখেন ও ভিক্ষা করিয়া উদর তৃপ্তি করেন ; এজন্য অপর দেবতারা

যাঁহার কণিকা প্রসাদ পাইলেই তৃপ্ত, সেই ভগবান্ বিষ্ণু হরের সহিত একাঙ্গ হইয়া আছেন, তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য মহাদেব তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন, এজন্য হরি হরকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বন্ধু বলিয়া দেহে সম্মিলিত হইয়া আছেন। হরের ললাটের অগ্নি মৃদুরশ্মি হইয়া বেহুলার উপর নিপতিত হইল।

অপরাপর দেবতাদের বেশ ভূষা ও দিব্য-কান্তি দেখিয়া বেহুলা বিস্মিত হইলেন।

বেহুলা প্রণাম পূর্ব্বক, গললগ্নীকৃত-পট্টবস্ত্র হইয়া দেব সভায় দণ্ডায়মানা হইলেন, দেবগণ বলিলেন, "বেহুলা আমরা তোমার স্বামী-ভক্তি ও তপস্যায় প্রীতি হইয়াছি, তুমি নর্ত্তকীশ্রেষ্ঠা, একবার আমাদিগকে নর্ত্তন করিয়া দেখাও।"

একি নিষ্ঠুর একি বিসদৃশ আজ্ঞা! এই কি নাচিবার সময়! কিন্তু দেবতাদের

আদেশ; বেহুলা উত্তর না করিয়া নাচিতে লাগিলেন।

বেহুলার সমস্ত শোক ও দুঃখ সেই নর্ত্তন-ভঙ্গীকে কোমল-করুণ করিয়া দিল, তাঁহার লাস্যে, তাঁহার হাস্যে,—তাঁহার কর-ভঙ্গীতে গভীর মনোবেদনা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কারুণ্যের উৎস সঞ্চার করিয়া দিল; তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে দেবচক্ষে অশ্রু দেখা যাইতে লাগিল, তাঁহার হাস্যে ওষ্ঠের যে দুঃখময় মাধুর্য্য ব্যক্ত করিল, তাহাতেও দেবচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন কোন বিলাপময়ী রাগিণীতে উচ্ছ্বাসিত বীণা-ধ্বনির ন্যায় দেব-চক্ষু বারংবার জলে পূর্ণ করিতে লাগিল।

রম্ভা তিলোত্তমা, মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গের বিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণের নর্ত্তন এই নর্ত্তনের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে,—তাহা তরল, উজ্জ্বল,

ও ক্ষণস্থায়ী রস বিতরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিত্তভার অপনোদন করে। এ নর্ত্তন সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের ; ইহার রস স্থায়ী, ইহা স্বর্গে দ্বিতীয় অমৃত ভাণ্ডের সৃষ্টি করিল, ইহার কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা দেবতাদিগের উপরও পুণ্যপ্রভাব বিস্তার করিল। তাহারা বেহুলা-নাচুনীর নৃত্য দেখিয়া পবিত্র হইলেন।

দেবতারা বলিলেন "পুণ্যশীলে, তুমি দৈবকর্ত্তৃক যত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছ, তন্মধ্যে আমরা যে তোমাকে নাচিতে আদেশ করিয়াছি ইহাও সামান্য নহে ; কিন্তু স্বামীর জীবনের জন্য তুমি কিনা করিতে পার, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা এই আদেশ দিয়াছিলাম, এই অবস্থায় তুমি ভিন্ন কে নাচিতে পারিত ! এই উৎকট পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়া তুমি আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছ, যাহা হউক তোমার অভীষ্ট লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না।"

দেব-সভা হইতে জয়-বিষহরি-মাতার আহ্বান হইল। তিনি দেব-সভায় নাই, তিনি ত বেহুলাকে স্বামীর প্রাণ দান করিবেন, দেবসভায় ইহার পূর্ব্বেই তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন; নেতা ধোপানী তাহাই শুনিয়া গিয়া বেহুলাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। এখন তিনি কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন ? দিক্‌-পালগণ বিষহরি মাতাকে খুঁজিতে লাগিলেন। চন্দ্রের দৃষ্টি জগতের প্রতি কোণে কোণে যায় না, এবং তিনি রাত্রি না হইলে ভাল দেখেন না, তাঁহার দ্বারা সন্ধান হইল না। সূর্য্য সারাদিন খুঁজিয়া রাত্রে রাত-কাণা হইয়া পড়িলেন,—বিষহরি মাতার সন্ধান কেহ বলিতে পারিল না, তখন বেহুলা-নাচুনীর মুখ শুকাইয়া গেল—তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া একটি দীর্ঘ শ্বাস পড়িল।

সেই শ্বাসে দেবাদিদেব শিব অধীর হইয়া পড়িলেন, তিনি নিজ-দেহের ভস্ম-বিন্দু নেতা-

ধোপানীর চক্ষে কজ্জলের ন্যায় পরিতে দিলেন। সেই বিভূতির কজ্জল পরিয়া নেতা বিষহরিকে সন্ধান করিয়া দেবসভায় উপস্থিত করাইলেন। ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ একত্র হইয়া বিষহরিদেবীকে লক্ষীন্দরের প্রাণ দান করিতে অনুরোধ করিলেন, বেহুলা নম্রমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন মনসাদেবী সেই দেব-সভায় একে একে তাঁহার পরিতাপের কথা বলিতে লাগিলেন। সনকা লুকাইয়া তাঁহাকে পূজা করিত, চাঁদ তাহা জানিতে পারিয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার রত্নময় বিগ্রহের পৃষ্ঠদেশ হিন্তালের লাঠিদ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলে; চম্পক-নগরে ঢেঁরা পিটাইয়া ঘরে ঘরে তাঁহার পূজা মানা করিয়া দেয়,— সদাগরের গুয়াবাড়ী ধ্বংশ-কালে সে ভ্রূকুটি করিয়া তাঁহাকে তাড়া করে, ভক্ত চন্দ্রকেতুর স্থাপিত ঘট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। শঙ্কুর-

গরুড়ীয়ার বন্ধুত্বের দর্পে সে প্রথমতঃ তাঁহাকে কীটপতঙ্গের ন্যায় নগণ্য মনে করিত, বন্ধু বিনষ্ট হইলেও তাঁহার দর্প কিছু মাত্র হ্রাস পায় নাই। যখন কালীদহের ঝড়ে সাত ডিঙ্গা মগ্ন হইতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তাঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার ভরসা দিয়াছিলেন কিন্তু যে হস্তে সদাগর শিবপূজা করিয়া থাকে তাহা তাঁহার পূজায় কলঙ্কিত করিবে না বলিয়া দেবীকে নানাপ্রকার কটূক্তি করে। বাম হাতে পূজা দিলেও তিনি সপ্তডিঙ্গা উদ্ধার করিয়া নিরাপদে তাহাকে চম্পক-নগরে পৌঁছাইয়া দিবেন, এই আশ্বাস দিয়াছিলেন, চাঁদ তাহাতেও সম্মত হয় নাই। যতই বিপদে পড়িতেছে, ততই সে তাঁহাকে বেশী ঘৃণা করিতেছে। মানুষ হইয়া দেবতাকে এরূপ ঘৃণা করিলে কোন্ দেবতা সহ্য করিতে পারিতেন? যদি চাঁদের পূজা না পাইলেও মর্ত্যধামে

তাঁহার পূজা প্রচারের কোন ব্যাঘাত না হইত, তবে এ সকল দুঃসহ অপমানও না হয় উপেক্ষা করা চলিত, কিন্তু মহাদেবের আদেশ—চাঁদের পূজা ভিন্ন তাঁহার পূজা জগতে প্রচার পাইবে না ; এ অবস্থায় তিনি কেমন করিয়া নগণ্য মানুষের নিকট মাথা হেঁট করিবেন এবং তাহার প্রার্থনা ভিন্ন তাহার পুত্রের জীবন দান করিবেন ?

দেবীর পরিতাপব্যঞ্জক দৃষ্টি মহাদেবের প্রতি বদ্ধ হইল, এবং তাঁহার চক্ষের প্রান্তে একবিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করিতে লাগিল।

মহাদেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া লক্ষ্মীন্দরকে পুনর্জীবিত করিতে আদেশ দিলেন। চাঁদ সদাগর যাহাতে পূজা করে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন প্রফুল্ল-চিত্তে বিষহরি লক্ষ্মীন্দরের পুনর্জীবন দান করিলেন, লক্ষ্মীন্দরের পায়ের একখানি অস্থি বোয়াল মৎস্য ভক্ষণ করিয়া-

ছিল, বহু সন্ধানে তাহা তিনি আনাইলেন। স্বর্গের বায়ুস্পর্শে অপূর্ব্ব কান্তি লাভ করিয়া পুনর্জীবিত লক্ষীন্দর বেহুলার পার্শ্বে দাঁড়াইল। দেবী বলিলেন, বেহুলা "আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তোমার আর কিছু অভীষ্ট থাকেত প্রার্থনা কর।" বেহুলা যুক্ত-করে মনসাকে বলিল—"আমি স্বামী লইয়া আনন্দে গৃহে ফিরিব, আর আমার ছটী জা' শঙ্খসিন্দূর বর্জ্জিত হইয়া নিরামিষ হাঁড়ি লইয়া পরিতপ্ত থাকিবেন,—তাহা কেমন করিয়া সহিব! মা বিষহরি, দাসীকে ভাসুরদিগের জীবন ভিক্ষা দান করুন।"

চন্দ্রধরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধর গোলাঘরের তত্ত্বাবধান করিতেছিল, এমন সময় নিকট-বর্ত্তী ফুলবাগান হইতে একটী সর্প আসিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছিল, তৎকনিষ্ঠ শ্রীকর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণকালে সর্প-কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছিল, তৃতীয় পুত্র

গুণাকর বাজপক্ষী শিকার কালে, তৎকনিষ্ঠ সৃষ্টিধর জলবিহারের সময়, পঞ্চম হীরাধর অন্তঃপুর প্রবেশ পথে এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ সৃষ্টি-ধর সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিবার সময় সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, মনসা দেবী তাহাদের প্রাণ হরণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, দেবীর-বরে তাহারা জীবন লাভ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল।

দেবীর প্রসাদে মগ্ন সপ্তডিঙ্গার স্থলে চৌদ্দডিঙ্গা লাভ হইল; মণি মাণিক্য-পূর্ণ "গঙ্গা-প্রসাদ",তাম্র ও কাংস্য-নির্ম্মিত কারু-কার্য্যময় বিবিধ দ্রব্য-পূর্ণ "সাগর-ফেণা" উৎকৃষ্ট বস্ত্র-পূর্ণ "হংস-রব" সমুদ্রজাত দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ-প্রবাল-পূর্ণ "রাজ-বল্লভ" প্রভৃতি ডিঙ্গা কালীদহের ভীষণ ঝড়ে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহারা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় মন্দাকিনী-নীরে উচ্চগ্রীব হইয়া লক্ষীন্দরের

আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেবীর আদেশে যক্ষগণ ও ঊনপঞ্চাশত বায়ু যে "মধুকর" ডিঙ্গাকে বহু চেষ্টায় হেলাইতে পারে নাই,ষোলশত দাড়ীযুক্ত সেই আশ্চর্য্য-গঠন নৌকা ডুবিতে ডুবিতে কতবার অগ্র-ভাগ জাগাইয়া উঠিয়াছিল, বায়ু-পুত্র স্বয়ং বহু ক্লেশে মধুকর নৌকাকে নাচাইয়া ডুবাইয়া-ছিলেন, সেই "মধুকর ডিঙ্গা" সদ্য-বর্ষণ স্নাত সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর ন্যায় সেই বিশাল নৌ-শ্রেণীর পুরোভাগে পরিদৃষ্ট হইল।

বেহুলা অসংখ্য প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দেব-সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় বিষহরি বলিলেন, "তোমার শ্বশুর যদি আমার পূজা না করে তবে যাহা দত্ত হইল, তাহার সকলই হারাইবে।" এই কথায় বেহুলার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মহাদেবের আশ্বাস-বাণী স্মরণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

১১

চৌদ্দডিঙ্গা লইয়া ছয়-ভ্রাতাসহ লক্ষ্মীন্দর যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলা এক ডিঙ্গাতে রহিলেন। সেদিন ত্রিবেণীর ঘাটে মন্দানিল-চালিত কেতকীরেণু দম্পতির মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল। বেহুলা বলিলেন "মৃত্যুকালে তুমি কি কহিতে চেষ্টা করিয়া আমায় বলিতে পার নাই, তোমার হস্তের ইঙ্গিতে আমি তোমার মুখের কাছে কাণ পাতিয়াছিলাম, তুমি কি বলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে পারিলে না, কেবল দুইটি নিশ্চল চক্ষের তারা আমার দিকে ন্যস্ত করিয়া রহিলে। এক একবার শিবচক্ষু হইয়া দৃষ্টি ছাড়িয়া যাইতেছিল, আবার ক্ষণমাত্র চক্ষু সুস্থ হইয়া নিম্ন-দৃষ্টি হওয়া মাত্র তাহা আমার দিকে ন্যস্ত করিতেছিলে, কি বলিতে চাহিয়াছিলে তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তোমার অসীম প্রেম মুমূর্ষু-কালে দুইটি

চক্ষুর দ্বারা আমার বুকের মধ্যে লিখিয়া গিয়াছিলে, তোমার মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, তখন মনে স্থির করিলাম, তোমার সঙ্গে চিতায় দগ্ধ হইলেও আমার শান্তি হইবে না, আমি তপস্যাদ্বারা ইহ-জীবনেই তোমাকে লাভ করিব।” এই কথা বলিতে বলিতে প্রফুল্লমুখী বেহুলার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

লক্ষ্মীন্দর সে কথা ভুলাইবার জন্য বলিলেন, “ঐ দেখ গাবরগণ শিঙ্গা ফুকারিতেছে ও ত্রিবেণী-স্নান-রত শত শত লোক আমাদিগের ডিঙ্গাগুলি দেখিতেছে।”

তীব্রগতিতে ডিঙ্গাগুলি বৈদ্যপুর ছাড়িয়া নারিকেল ডিঙ্গায় পৌঁছিল; সেই খানে মনসার মন্দির ছিল, তথায় তাঁহার পূজা দিয়া তাঁহারা পুনরায় ডিঙ্গা ছাড়িয়া দিলেন ও বোয়ালিয়া-ঘাট ছাড়িয়া জাগুলে উপনীত হইলেন। বেহুলা যে কষ্টে ভেলায় ভাসিয়া

সেই সকল স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন—অশ্রুসিক্তচক্ষে তাহা লক্ষ্মীন্দরকে জানাইলেন লক্ষ্মীন্দরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মহেশ্বর-ঘাটায় লখাইএর শবে প্রথম মাছিতা পড়ে, তখন বেহুলার যে শোক হয়, তাহা শুনিয়া পাষাণ বিগলিত হয়। গোদা-ঘাটে গোদা ভাসিয়া গিয়াছিল, বেহুলা মনসা-দেবীকে স্মরণ করিয়া গোদাকে উদ্ধার করিতে প্রার্থনা করিলেন, গোদা বেহুলার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করাতে ছয় মাস কাল জলে ভাসিতেছিল, মনসা দেবী তাহার জীবন মাত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে রামকড়ি কর্ণে ও শঙ্খের মালা গলদেশে পরিয়া মৃতপ্রায় গোদা ভাসিতে ভাসিতে ঘাটে উঠিল, প্রাণ পাইয়া গোদা বেহুলাকে বলিল,—"মা, আমি তোমায় না চিনিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি, পাপিষ্ঠ সন্তানের দোষ লইবেন না।" বেহুলার বরে গোদ

ভাল হইয়া গেল। শৃগাল-ঘাটা ছাড়িয়া নৌকা গঙ্গাপুরে পৌছিল। তথা হইতে বর্দ্ধমান, গোবিন্দপুর ও যুবরাজপুর পার হইয়া বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় সকলে চাঁপাতুলার ঘাটে উপনীত হইলেন। বেহুলা চাঁপাতলার ঘাট দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু, এই ঘাটে আমার ভ্রাতারা আমাকে ফিরাইয়া নিতে আসিয়াছিল, তাহাদের আনীত নানা খাদ্যদ্রব্য চাঁপা-গাছের তলায় পোঁতা আছে, বিষহরি দেবীর বরে তাহা নষ্ট হয় নাই, মাটী খুঁড়িলে তাহা পাওয়া যাইবে। আমার পিতৃগৃহের খাদ্যাদি খাইতে বড় সাধ হইতেছে।" মৃত্তিকা খুঁড়িয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট সন্দেশ, চাঁপাকলা, ক্ষীরখণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া গেল, সেগুলি যেমন তেমনই রহিয়াছিল। বেহুলা সাশ্রুনেত্রে ভাসুরদিগকে ও স্বামীকে তাহা পরিবেশন করিয়া নিজে প্রসাদ খাইলেন। তাঁহারা

চাঁপাতলা পার হইয়া নিছনি গ্রামের নিকট উপনীত হইলেন। তখন বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের পদ জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞা দাও, একবার আমার দুঃখিনী মাতাকে দেখিয়া যাইব, আমার মা পাগলিনী হইয়া আছেন।"

লক্ষ্মীন্দর বলিলেন—"চল আমরা ছদ্ম-বেশে নিছনি গ্রামে যাই। তখন বেহুলা আনন্দে কষায়-বস্ত্র পরিয়া মাথার কেশে জটা বাঁধিলেন, অঙ্গে বিভূতি মাখিয়া কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল পরিলেন। লক্ষ্মীন্দর যোগী সাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নিছনিগ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল। "এমন যোগী ও যোগিনী আমরা কখনও দেখি নাই, ঠিক যেন শিব ও ভবানী।" বাড়ুই-পাড়া অতিক্রম করিয়া বেহুলা সায়-বেণের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। পিতৃগৃহ দেখিয়া বেহুলার চক্ষু বারংবার অশ্রুপূর্ণ হইতে

লাগিল। বেহুলা মন্থর-গতিতে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন অমলা হরি-সাধুর ভাত স্বর্ণ-থালায় লইয়া রন্ধন-গৃহ হইতে বহির্গত হইতে ছিলেন। অপূর্ব্ব যোগী ও যোগিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভাতের থালা হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "যোগিনী আমার বেহুলারই মত। মা যোগিনী আমার এক কন্যা পাগলিনীর মত স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে লইয়া ভেলায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার শোকে দেশের পশু পক্ষী ঝুরিয়া মরিতেছে। অশ্বশালে অশ্ব ও হাতীশালে হাতী বেহুলার নাম শুনিলে খাদ্য দ্রব্য খায় না, ঝর্ ঝর্ করিয়া তাদের চক্ষের জল পড়িতে থাকে, আমার মত পাষাণী আর নাই। তুমি যে হও সে হও, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না।" বলিয়া উন্মাদিনীর মত অমলা বেণেনী যোগিনীকে বক্ষে লইয়া মূর্চ্ছিত

হইলেন। তখন বেহুলার অবিরল চক্ষের জল পড়িতেছিল, লক্ষ্মীন্দরও তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে ছিলেন। অমলার মোহ ভঙ্গ হইলে বেহুলা তাঁহার মস্তক ক্রোড়দেশে রাখিয়া তাহা অশ্রুনিষিক্ত করিয়া বলিলেন, "মা তুমি কেঁদ না, এই তোমার হতভাগিনী কন্যা এবং অশ্রুসিক্ত যোগী তোমার জামাতা।" তখন সায়-বেণের ঘরে এক আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল, সেই আনন্দে হাসি নাই, কেবলই চক্ষের জল। সায়-বেণের ঘরে নিছনি গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িল, তরুণী বণিক্-বধূগণ বেহুলার পদরজঃ লইয়া মাথায় রাখিতে লাগিল।

বেহুলা একদিনও তথায় রহিলেন না, মাতাকে বলিলেন,—"মা, তোমার এক কন্যা হারাইয়া তুমি এমন হইয়াছ, আর সাত পুত্র ও পুত্র-বধূকে হারাইয়া মা সনকা কেমন করিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে

তাঁহার পুত্রগণকে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি শান্তি পাইব না। আমরা এখনই চলিয়া যাইব।”

অমলা বলিলেন,—“অন্নপূর্ণাও তিনটি দিন পিত্রালয়ে থাকেন, মা তুমি কি পাষাণী হইতেও নিষ্ঠুর? একটি দিন থাকিয়া যাও।” বেহুলা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কপট যোগী ও যোগিনী সাশ্রুনেত্রে বিদায় হইলেন।

চৌদ্দডিঙ্গা চম্পক-নগরে উপনীত হইল। তথায় বেহুলা ডুমুনীর বেশ ধারণ করিলেন। তিনি একজন কারিগরের দ্বারা একখানি ব্যজনীতে চাঁদবেণের বাড়ীর সকলের মূর্ত্তি উৎকৃষ্ট ভাবে অঙ্কিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মণি রত্নে ঝলমল করিতেছিল। সেই ব্যজনী হাতে ঘুরাইয়া বেহুলা অপূর্ব্ব ডুমুনী-বেশে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

সে দিন চাঁদ সদাগর লখাইএর ষড়্-মাসিক শ্রাদ্ধ কার্য্যে-নিযুক্ত, চাঁদের ছয়টি

বিধবা পুত্র-বধূ গাঙ্গুড়ের ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল,—তাহারা মূল্যবান ব্যজনী হস্তে সুন্দরী ডুমুনীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— "এ ব্যজনী দিয়া কি করিবে?" বেহুলা বলিলেন "লক্ষ মুদ্রা হইলে এ ব্যজনী বিক্রয় করিব।" ছয় বধূ ভাল করিয়া সেই ব্যজনী লক্ষ্য করিয়া দেখিল তাহাতে তাহাদের বাড়ীর পরিজনদের চিত্র অঙ্কিত আছে; ইহা দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া গেল। ডুমুনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বেহুলা বলিলেন,—"আমার নাম বেহুলা ডুমুনী, আমার পিতার নাম সায়-ডোম—শ্বশুরের নাম চাঁদ ডোম ও স্বামীর নাম লখাই-ডোম" এই অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়া তাহাদের চক্ষে দর দর জল পড়িতে লাগিল।

তাহারা ঘরে যাইয়া সনকাকে এই কথা বলাতে তিনি বাসর ঘরে যাইয়া দেখেন, বেহুলার কথিত স্বর্ণ দীপ নিবে নাই, দাড়িম-

গাছের তলা খুঁড়িয়া দেখিলেন, স্বর্ণ থালায় ভাত সদ্যঃ উষ্ণ রহিয়াছে; তখন সনকা পাগলিনীর বেশে ঘাটে উপনীত হইলেন, ব্যজনী দেখিয়া তিনি তথায় হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ডুমুনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমরা ডোম, ধুচুনী ও চুপড়ি বিক্রয় করিয়া খাই।" ডুমুনীর চাঁদপানা মুখ দেখিয়া তাঁহার আর একখানি মুখ মনে পড়িল, সে মুখ-খানি সনকা ভুলিতে পারেন নাই, এক দিন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে মুখ হৃদয়ে গাঁথা ছিল, সেই শরদিন্দুনিভমুখী পুত্রবধূর কথা মনে পড়াতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, গাঙ্গুড়ের কূলে বণিক্-সিমন্তিনী আছাড়ি বিছাড়ি খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন ডুমুনী শ্বাশুড়ীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "আর কেঁদ না মা,

তোমার হারানিধিগণকে একবার দেখ, আমি বড় কষ্টে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আনিয়াছি।" এই সময়ে একবারে সাত ছেলে যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া মাতার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন—চমৎকৃত হইয়া ষড়্‌বধূ সরিয়া পড়িলেন; অকস্মাৎ কে যেন অদৃশ্য হস্তে তাহাদের মাথায় সিন্দূর পরাইয়া দিল, হাতে স্বর্ণ-মণ্ডিত শঙ্খের বালা জুড়িয়া দিল। কিন্তু বেহুলা সরিয়া গেলেন না। বেহুলা বলিলেন—"যে পর্য্যন্ত শ্বশুর মহাশয় মনসা দেবীর পূজা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের চম্পক-নগরে প্রবেশের অধিকার নাই, এই জন্য ছল করিয়া আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছি।"

১২

হে দেব নীলকণ্ঠ! সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অমৃত, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত, ঐরাবত এবং অমূল্য রত্নরাজি দেবতারা লুণ্ঠন করিয়া

লইয়া গেলেন, তখন তোমার আহ্বান হয় নাই, কিন্তু যখন বিষ উত্থিত হইয়া বিশ্বনাশ করিতে উদ্যত হইল, দেবগণ তখন তোমার শরণ লইলেন, বিষপান করিয়া তুমি বিশ্ব রক্ষা করিলে ; হে নীলকণ্ঠ, তোমার নীলকণ্ঠ এই অমৃত-কথার স্বাক্ষী হইয়া আছে। সুমন্ত-মুণি যখন সুরেশ্বরী গঙ্গাকে বলিলেন, দেব-সমাজে রাত্রিকালে যখন তুমি অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে ছিলে, তখন তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর পড়িয়াছিল, তাঁহাদের দুষ্ট চক্ষে দৃষ্ট হইয়া তুমি পতিতা হইয়াছ। আমি তোমাকে আর আশ্রমে স্থান দিব না।” আশ্রয়চ্যুতা গঙ্গা বিশ্বে খুঁজিয়া স্থান পাইলেন না, অপবাদ-ভীত দেবতারা কেহ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইলেন না। তখন পাগল বেশে ধূর্জ্জটি আসিয়া পরম করুণায় গঙ্গা দেবীকে মাথায়

করিয়া লইলেন। সুর-জগত বিস্মিত হইয়া গেল।

হে নীলকণ্ঠ! তুমি সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণই অতিক্রম করিয়াছ। যাহা শুদ্ধ, যাহা জগতের কল্যাণকর, তাহা তুমি পরিহার করিয়াছ,—যাহা ঘৃণিত, অশুচি, ও অকল্যাণ-হেতু বলিয়া পরিত্যক্ত সেই ভস্ম ও চিতাগ্নি—তোমার আদৃত। চন্দন, অগুরু প্রভৃতি তুমি চাহ না, শ্মশানের শব-কঙ্কাল ও চিতাভস্মই তোমার প্রিয়। তোমার ধন-রক্ষক কুবের, কিন্তু সে ধনরত্নের প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত নাই। যুগে যুগে তুমি একবারও কুবেরকে স্মরণ কর নাই। অন্য দেবতাদের ভূষণ-বাহনের ঘটায় স্বর্গপুরী উজ্জ্বল,—তোমার অনুচর ভূত প্রেত, অসভ্য নন্দী, ভৃঙ্গী, যাহাদের স্পর্শ অপর দেবতারা ঘৃণায় পরিত্যাগ করেন, তুমি নিঘৃণ,—তাহারাই তোমার প্রিয় সখা; তাথৈ তাথৈ রবে

তাহারা তোমার সঙ্গে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। অপর দেবতাদের কণ্ঠে পারিজাত-হার তোমার কর্ণে বিষাক্ত ধুস্তূর-পুষ্প। জগত নাশেও তোমার আনন্দ নষ্ট হয় না, যখন জগত ধ্বংস পায়, তখন তোমার মুখে প্রলয়-বিষাণ বাজিতে থাকে এবং তোমার মুখে পবিত্র "ওঁকার" উচ্চারিত হয়। তুমি চির-প্রশান্ত, কামনা তোমার কোপ-দৃষ্টিতে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল পঙ্কজ-সদৃশ পাণি-যুগল অঙ্কেতে স্থাপিত করিয়া অন্তশ্চর মরুৎ নিরোধপূর্ব্বক যখন তুমি সমাধি-সাগরে নিমগ্ন হও, তখন কত যুগ তোমার উপর দিয়া চলিয়া যায়; তখন কত ইন্দ্র, কত ব্রহ্মার উৎপত্তি ও বিলয় হয়। হে অনাদি-দেব, তুমি একমাত্র ধ্রুব-সত্যের ন্যায় সমা-ধিতে বিরাজ করিতে থাক।

আমি ক্ষুদ্র হইলেও তোমারই কণিকা; আমারও মনে হয়—আমার পিতা নাই,

মাতা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, আমার পুত্র-কলত্র নাই, আমি কখনও জন্মি নাই, আমি কখন মরিব না। দিক্ সকল আমার অম্বর, ধ্বংসের মধ্যেও আমি নিত্যস্থায়ী, পরিদৃশ্যমান কিছুর মধ্যেই আমি নাই,—আমি আনন্দময়, সত্য-স্বরূপ।

সাতালী-পর্ব্বতে অবস্থিত চাঁদ-সদাগর এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্মীন্দর প্রভৃতির পুনরাগমনের কথা শ্রুত হইয়াই নির্জ্জনে অপসৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত-রূপে চিন্তা করার পরে চন্দ্রধরের মুখে এই শ্লোকগুলি উচ্চারিত হইল ;—

"ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখম্
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদং ন যজ্ঞঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মৃত্যুর্নশঙ্কা ন মে জাতি-ভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥”

ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে চন্দ্রধর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ পূর্ব্বক আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথাপি মনের অন্তস্তল হইতে বেহুলা ও লক্ষীন্দর প্রভৃতির পুনরাগমন সংবাদ-জনিত প্রীতি উথলিয়া উঠিল। তিনি মনসা দেবীর পূজা না করিলে তাহারা চলিয়া যাইবে, তখন সনকার অবস্থা কি দাঁড়াইবে, এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি ধর্ম্মভাবকে যত প্রবল চেষ্টায় আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তীব্র আশঙ্কা ততই সে ভাবের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতে লাগিল। এমন সময়ে চাঁদ

দেখিতে পাইলেন, অতি জীর্ণ কন্থা-পৃষ্ঠে এক গলিত-চর্ম্ম শীর্ণকায় বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্ব-স্থিত একটি উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার শাখায় উপবেশন করিল এবং কুঠার-দ্বারা সেই শাখাটিরই মূলচ্ছেদ করিতে লাগিল। চাঁদ ভাবিলেন লোকটা বিকৃত-মস্তিষ্ক। শাখা ছিন্ন হইলে এখনই সে উন্নত বৃক্ষের শীর্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হইবে।

চাঁদ ডাকিয়া বলিলেন, "পাগল কি করিতেছ? এখনই পড়িয়া মরিবে।"

বৃদ্ধা উত্তর না দিয়া বলিল—

"ন মৃত্যুর্নশঙ্কা"—

চাঁদ চমকিয়া উঠিলেন, এই শ্লোক তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছেন, বৃদ্ধ কি অজ্ঞাতসারে তাহা শুনিয়া ফেলিয়াছে?

চাঁদকে চমৎকৃত দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "আমাকে পাগল বলিলে, তোমার মত পাগল কি কেহ আছে? তুমি মনসা-

দেবীর সঙ্গে বৃথা দ্বন্দ্ব করিয়া স্বীয় গৃহের উচ্ছেদ করিতেছ কেন?"

চাঁদ বলিলেন, "সে অনেক কথা,—তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না!"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—"এই যে—'ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ' বলিয়া আপনাকে এতটা উর্দ্ধে কল্পনা করিতেছিলে, মনসা-দেবীর সঙ্গে বাদ করিয়া কি তুমি প্রকৃতই সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থার পরিচয় দিতেছ? তুমি এই কথার উত্তর দাও, আমি পলিতকেশ জীর্ণ বৃদ্ধ দেখিয়া ঘৃণা করিও না, তুমি ত এই মাত্র বলিতেছিলে "মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।" চাঁদ বৃদ্ধকে কোন সন্ন্যাসী মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে, সুতরাং বলিতেছি শোন,—যে দেবতা দুঃখ প্রদান করেন কিংবা সাংসারিক সুখ দ্বারা ভক্তকে পুরস্কৃত

করেন, আমি তাঁহার সেবক নহি। আমি বিদ্বেষ বশতঃ মনসা দেবীকে উপেক্ষা করি নাই। আমার পুরীতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। আমি সুখান্বেষী কি দুঃখ-ভীত নহি। আমি আত্ম-বস্তু, চিৎস্বরূপ আনন্দময়,—আমার গুয়াবাড়ীধ্বংস হইল, কিংবা সাত-ডিঙ্গা জলমগ্ন হইল, অথবা সাতটি পুত্রই ধ্বংস হইল,—তাহাতে আমি বিচলিত হই নাই, সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আমার নিকট অতি তুচ্ছ, এজন্য আমি মনসা দেবীকে অগ্রাহ্য করিয়াছি,—সংসার—সমুদ্রের সমস্ত হলাহল—আমার নিকট নগণ্য,—এজন্য আমি মনসাকে উপেক্ষা করিয়াছি। এই দুঃখ সুখ তরঙ্গ মায়িক ও মিথ্যা,—আমি নিত্য-বস্তুর সন্ধান করিতেছি, আমি স্ত্রী-লোকের ন্যায় দেবতার মঠে ধন্না দিয়া সাংসারিক কোন কামনা-সিদ্ধির প্রার্থনা জানাইবার লোক নহি। সুখে আমি

বিগতস্পৃহ, দুঃখকে আমি ভয় করি না, বৃদ্ধ তুমি আমার হৃদয়ের বল জান না,— এজন্য মনে করিতেছ আমি দ্বেষ-পরবশ হইয়া তাহার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতেছি।

এই দেবতাটি গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে চাহে। আমি তাঁহাকে পূজা দিব না, তবু সে পূজা পাইতে লোলুপ। মনসা যাহা নিতে পারে বা দিতে পারে আমি তাহার উপাসক নহি। আমি কেন তাহার পূজা করিব? আমার দেবতা তাহার অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আমি তাঁহাকে আমার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি। যাহারা সুখ খোঁজে, তাহারা দুঃখ পায়, সুতরাং সুখ দুঃখের কর্ত্রী মনসার পূজা আমি বারণ করিয়াছি।"

বৃদ্ধ বলিল, "মিথ্যা কথা, তুমি সুখ দুঃখের ঊর্দ্ধে উঠিতে পার নাই। এই মাত্র লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার পুনরাগমন-জনিত

নানা সুখ ও আশঙ্কার কথায় তোমার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল। তুমি কোনও-রূপে আত্মস্থ হইতে পার নাই।”

চাঁদ চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিলেন। “এ শুধু সন্ন্যাসী নহে, ইহার যোগবল অসাধারণ, আমার মনোভাব জানিল কিরূপে?”

চাঁদ বলিলেন—“আমি জনক ঋষির ন্যায় সংসারে থাকিয়া সংসারের চিন্তা হইতে উর্দ্ধে থাকিতে চেষ্টা করি। সময়ে সময়ে সাংসারিক সুখ দুঃখের স্রোত হৃদয়ে আসা অনিবার্য্য, কিন্তু তাহা দূরে রাখিবার চেষ্টাই পুরুষাকার।”

বৃদ্ধ বলিল—“তুমি জনক-ঋষি হইতে পার নাই, জনক-ঋষি একবারে সাংসারিক সুখে দুঃখে অভিভূত হইতেন না, যখন রাজধানী মিথিলাপুরী অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন শুকদেব রাজর্ষিকে নিশ্চিন্তভাবে

বাপীতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া শশব্যস্তে বলিলেন "মহারাজ দেখিতে পাইতেছেন না, অগ্নিতে আপনার সমস্ত পুরী ধ্বংস হইয়া গেল।" রাজর্ষি হাসিয়া বলিলেন "এ অগ্নিতে আমার কিছুমাত্র ধ্বংস হইতেছে না।" তুমি কি সেই ভাবে তোমার বিপদ রাশি সহ্য করিতে পারিয়াছ? এই সাতালী-পর্ব্বতে যখন মহাদেবের স্তোত্র পাঠ করিয়াছ, তখন মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ শ্বাস তোমার বক্ষ-ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে অশ্রু পড়িয়া তোমার হস্তের বিল্বদল ও জবাপুষ্প কলঙ্কিত করিয়াছে, মহাদেব সেই উপহার গ্রহণ করেন নাই। তুমি যে নির্ব্বাণ-ষটক পাঠ করিতেছিলে—সে ভাবের কল্পনা করিতেছ মাত্র, তুমি তাহা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পার নাই। উহা যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে,—তাঁহার ত্যাগ স্বাভাবিক, তাহা জ্বালার উৎপত্তি করে না। তিনি

ঐশ্বর্য্যের স্তূপে বসিয়া থাকিলেও তাহা চিতা-ভস্মের ন্যায় দেখায়। বাহ্যবৈভবের কোনই আকর্ষণী-শক্তি থাকে না। তুমি শিবকে ইষ্টদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাক, অথচ তাঁহার সহায়তা ছাড়া মায়া-পাশ ছেদন করিতে প্রয়াস পাইতেছ, তদ্দ্বারা পাশের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছ মাত্র, তুমি যদি অহঙ্কৃত না হইতে, তাহা হইলে মনসা-দেবী কখনই তোমার পূজা গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। তুমি অহঙ্কৃত, আত্মবলে শিব-মায়া-মুক্ত হইবে, এই স্পর্দ্ধিত চেষ্টার দ্বারা ভোগের দেবতাকে আকর্ষণ করিতেছ, এজন্য তিনি তোমায় ছাড়িয়া দিতেছেন না। তুমি তাঁহাকে নিজে আনিয়া আপনাকে বুঝাইতেছ, তাঁহাকে তুমি তাড়াইয়া দিতে পার। তুমি শিব মায়া-স্বরূপা মনসা-দেবীকে স্বীকার কর এবং তাঁহার পদে প্রণাম কর, তাহা হইলে

তাঁহার অধিকার হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। রাজসিক ভাবকে প্রাধান্য দিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়ার কল্পনা বৃথা।"

এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সদাগরের মনে হইল যেন তাঁহার কর্ণে শতকোটি বীণা নিনাদিত হইল। স্বশক্তিতে নহে—অবিনয়ে নহে, ভগবৎ শক্তিতে ও পূর্ণ বিনয়ে তিনি শিব-মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবেন, এই কথায় তাঁহার হৃদয় অভূত-পূর্ব্ব সান্ত্বনা লাভ করিল। তিনি যে বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত ছিলেন, কে যেন অমৃত-নিষেকে তাহা জুড়াইয়া দিল। আপনা আপনি তাঁহার করদ্বয় ভক্তিভরে যুক্ত হইল, আপনা আপনি তাঁহার চক্ষে অজস্র অশ্রুবিন্দু উপহার-স্বরূপ উদ্গত হইল, আপনা আপনি ভক্তিভরে জানুদ্বয় নত হইল, অতি বিনীত ভাবে তিনি বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বিস্ময়ের সহিত

দেখিলেন তথায় বৃদ্ধ নাই—তৎস্থলে জটা-জূটমণ্ডিত, রজতগিরিনিভকান্তি, অঙ্গে ভস্ম-মাখা—ফণীর বলয়, ফণীহার ও ফণীমুকুটে, কলকল-নাদী গঙ্গাধারা-বিধৌত জটা-কলাপে, ফণী-নীবিবন্ধ-ধৃত দ্বীপী-চর্ম্মাবৃত কটি-তটে, অর্দ্ধেন্দু-বিরাজিত বিশাল ললাটে সেই মূর্ত্তি আকাশ-পটে দীপ্যমান।

সদাগর আরও দেখিলেন হরের ত্রিনেত্র জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। তাঁহার সমস্ত কান্তিতে কাম-পরাজয়ের লক্ষণ বিদ্যমান। তাহাতে রাগ, দ্বেষ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের চিহ্ন মাত্র নাই। সেই মূর্ত্তি দেখামাত্র সদাগর বুঝিলেন, তিনি নিজে কত দীন হীন। মহাদেবের দেহের চিতা ভস্মে ঐহিক সুখ ভস্ম হইয়া গিয়াছে, পরমানন্দ জাগ্রত রাখিয়াছে, আর তাঁহার দেহের ধূলিকণা অঙ্গের মলিনতা জ্ঞাপন করিতেছে মাত্র।

সদাগর অনুভব করিলেন, মহাদেবের কর্ণের ধুস্তূর কুসুম হইতে অপূর্ব্ব সুরভি নিঃসৃত হইতেছে ;—স্বর্গ, মর্ত্ত্যের কোন পুষ্পে তাহা নাই, তাহার অমল ধবল জ্যোতিতে জগতের সকল কুসুমের বর্ণ পরাস্ত। তাঁহার শরীর-বেষ্টী ত্রিলোক-ভীতিকর সর্পের শব্দে যেন যোগিবরের পরমানন্দ উথলিয়া উঠিতেছে—যাহা অনিত্য তাহারই ধ্বংস সেই শব্দে সূচিত হইতেছে।

সদাগর বুঝিলেন, চন্দ্রচূড় বিশ্বহিতের জন্য বিশ্বের বিষরাশি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বিষ তাঁহার কণ্ঠকে নীলোজ্জ্বল করিয়াছে, সেই বিষ সর্পরূপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিরাজিত ও তাহাই তাঁহার কর্ণের ধুস্তূর কুসুমে জ্যোতিষ্মান্। এই বিষ-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সুধার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই আনন্দময়ের চন্দ্রবদনে ও ধুস্তূরফুলের শুভ্র-

তায় প্রতিভাত। তদীয় প্রীতি-ফুল্ল দৃষ্টি-পাতে সমস্ত জগত কৈলাস-পুরীর মহিমা-মণ্ডিত হয়, হলাহল পরাস্ত হয় ও শার্দ্দুল এবং মেষকে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ করে।

সদাগর দেখিলেন—দিক্ দিগন্ত সেই জ্যোতির্ম্ময়ের রূপে উদ্ভাসিত। সেই জ্যোতিই পুরুষবরের অম্বর-স্বরূপ, মেঘ-মালার স্বর্ণছটা ও নিবিড় গাঢ় কৃষ্ণতা যেন তাঁহারই মুক্ত জটাজূটের ছায়ার ন্যায় দিক্‌দিগন্ত ছড়াইয়া আছে, সেইরূপ যেন ক্রমশঃ জগতের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। যেন সেই চিতাভস্ম সংসারকে অসার প্রতি-পন্ন করিয়া নিত্য সত্যকে কষিত করিয়া দেখাইতেছে, যেন গঙ্গাধারার কলরব এই পৃথিবীর পরপারে কোন আনন্দময় লোকের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সদাগর যুক্ত-করে সেই মহামূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া

জানু পাতিয়া বসিয়া রহিলেন, অশ্রুজল চক্ষে উছলিয়া উঠিল।

তখন তিনি শুনিতে পাইলেন "তুমি মনসাকে আমার আত্মজা বলিয়া জানিও, তুমি তাঁহার মুখ দেখিবে না ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পূজা দিবেনা বলিয়াছ, মুখ ফিরাইয়া বামহস্তে অঞ্জলি দিলেই তিনি প্রীতা হইবেন।"

দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, সমস্ত জগৎ যেন ভূত-ভাবনের চিহ্ন-স্বরূপ হইয়া পড়িয়া রহিল। চন্দ্রধর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি দক্ষিণহস্তে মস্তক ভূতলে আনম্র করিয়া তোমার আত্মজার পূজা প্রদান করিব।"

১৩

সদাগর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন,— দেখিলেন গাঙ্গুড়ের কূলে সমস্ত চম্পকনগর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সনকা বেহুলাকে ক্রোড়ে

লইয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার সাতপুত্র নত চক্ষে মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, যে তাহাদিগকে দেখিতেছে, তাহারই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সদাগর সেই পথে আসিলে একটা উচ্চ কলরব উত্থিত হইল, বেহুলা কাঁদিয়া যাইয়া তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইলেন। সদাগর সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন, বেহুলার দেহ হইতে মহাদেবের কর্ণান্ত-শোভী ধুস্তূর-কুসুমের অপূর্ব্ব গন্ধ নিঃসৃত। তিনি দেখিলেন মহাদেবের দেহের যে কামনাহীন নির্ম্মল কান্তি, বেহুলার রূপে তাহারই আভা পড়িয়াছে। বেহুলার চক্ষুজলে ধূর্জ্জটির জটালগ্ন গঙ্গার পবিত্রতা—এই মাত্র তিনি তাঁহার উপাস্যকে দেখিয়া আসিয়াছেন,—তিনি বেহুলার রূপে,—কণ্ঠ-স্বরে এবং অঙ্গ-সৌরভে—যেন সেই উপাস্যদেবতার ছায়া ভাসিতে দেখিলেন। বেহুলা কাঁদিয়া

বলিলেন "পিত আমাদিগকে কোন প্রাণে ফিরিয়া যাইতে বলিবে, আমরা বড় কষ্টে আবার তোমার গৃহে আসিয়াছি মনসা-দেবীর পূজা না করিলে আমরা আবার ফিরিয়া যাইব,—তুমি নিষ্ঠুর হইও না, মহাদেব বলিয়াছেন এবার তোমার সুমতি হইবে. তুমি বিষহরি মাতার পূজা করিবে।"

চন্দ্রধরের উত্তর শুনিবার জন্য সমস্ত চম্পক-নগর-বাসী লোক উৎকর্ণ হইয়া রহিল, তাহাদের বক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। সনকা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই উত্তর শুনিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। সাত পুত্র মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের চক্ষে ঘন ঘন জল-বিন্দু পড়িতে লাগিল।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া চন্দ্রধর কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল ; ধীরে ধীরে তাহার গণ্ডে দুই বিন্দু

অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বহু কষ্টে আত্মসংযমপূর্ব্বক বলিলেন, "মা, আমি এত দিন শিবপূজা করি নাই, দাম্ভিকতার পূজা করিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে তুমিই শিব-পূজা করিয়াছ, না হইলে তোমার দেহে শিবজ্যোতিঃ কেন? নগরে প্রচার করিয়া দাও, আজ চন্দ্রধর-বণিক্ তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে,—আজ শিবাত্মজা—দেবীর পূজা নিজ হস্তে করিয়া জীবন সার্থক করিব।"

১৪

বড় বড় স্ফটিকের স্তম্ভের উপর ময়ূর-পুচ্ছ-খচিত ছাদ নির্ম্মাণ করা হইল, তাহার ঝালরসমূহ হীরা, মণি ও বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর সকলে গ্রথিত হইয়া স্বর্ণপ্রদীপ-মালার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। মনসা-দেবীর সুবর্ণ-বিগ্রহ গঠিত হইল; শ্রাবণ

মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে চাঁদ মনসাদেবীকে পূজা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পুরোহিত জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিলেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র পড়িলাম, তবু বিগ্রহে শক্তির সঞ্চার হইতেছে না কেন? বিস্মিত হইয়া চাঁদ সদাগর উৰ্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক দেখিলেন, চতুর্ভূজা, স্বর্ণ খচিত রক্ত পট্টাম্বর ধারিণী, হংসারূঢ়া বিষহরি দেবী আকাশ হইতে অবতরণ করিতে উদ্যত হইয়াও যেন কেন মণ্ডপে আসিতে পারিতেছেন না, বেহুলা যুক্ত করে দেবীর অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে,—শুনিতে পাইলেন,—সদাগরের মন্ত্রসিদ্ধ হিন্তালের যষ্টির ভয়ে তিনি মণ্ডপে আসিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন,—সদাগর বলিলেন এই হিন্তালের যষ্টির আর ভয় করিবেন না—

"বেহুলা বিনয় করে আসিয়া শ্বশুরে।
হিন্তালের লাঠি তুমি ছুড়ে ফেল দূরে॥"

সদাগর তখন হিন্তালের যষ্ঠি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড মনসাদেবীর ধূনাতে ব্যবহার করিলেন।

দেবীর উদ্দেশে, চাঁদ সদাগর এই স্তোত্র পাঠ করিলেন ঃ—

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং
চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়ামুদারাং সুললিত-
নয়নাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণি-
গণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেঽহং সাষ্টানাগামুরুকুচ-
যুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্ ॥”

মনসাদেবী প্রীত হইয়া চন্দ্রধরকে বর দিতে চাহিলেন, চন্দ্রধর স্বয়ং সর্ব্বদা কামনার ঊর্দ্ধে থাকিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি কি বর চাহিবেন? বর না চাহিলে পাছে বিষহরি দুঃখিত হন, এজন্য যুক্ত করে

বলিলেন, "আমার পরম সুহৃৎ শঙ্কুর গাড়ুরীর জীবন দান করুন।"

মনসার কৃপায় শঙ্কুর গাড়ুরী প্রাণ পাইল। চাঁদের গৃহে কতকদিন ব্যাপিয়া ক্রমাগত উৎসব চলিল, নানা দিগ্‌দেশ হইতে তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ সেই উপলক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, আত্মীয়-সভায় একদা চন্দ্রধরের জ্ঞাতিভ্রাতা উচ্চবংশের দর্পে-স্ফীত, নীলাম্বর বণিক্ ঘাড় বাঁকিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীন্দর কোন্ ওঝা বা দেবতার কৃপায় জীবনলাভ করিয়াছেন, তাহা ভগবান্ জানেন, নবযুবতী কুলবধূ ছয়মাসকাল গৃহ ছাড়িয়া ছিল, সে এই ছয়মাসকাল কি ভাবে কোথায় ছিল—তাহার সাক্ষী নাই, এ অবস্থায় ইহাকে গৃহে রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।" চাঁদের বিশাল পুরীতে অসংখ্য লোক উপস্থিত ছিলেন, এই হীন সন্দেহে তাঁহারা লজ্জায় মস্তক অবনত

করিলেন। অনেকের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কুটিল সমাজনীতিপ্রাজ্ঞ নবখণ্ড-বাসী জনার্দ্দন রায় বলিলেন,—নীলাম্বরের কথা ঠিক, চাঁদ এরূপ বধূকে লইয়া ঘর করিলে বড় নিন্দার কথা হইবে। বর্দ্ধমান-বাসী ধূষদত্ত এই কথায় বলিলেন, "সমস্ত বণিককুল যাহার সতীত্ব-মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই পুণ্যশীলার সম্বন্ধে এরূপ কথা আমরা শুনিতে চাহি না।" কিন্তু নীলাম্বর ও ধনপতি এই ব্যাপার লইয়া উত্তেজিত আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ক্রমেই ইহার কূটার্থ নিষ্কাসন করিয়া বেহুলা সম্বন্ধে নিন্দাবাদ গুরুতর করিয়া তুলিলেন, তখন ধূর্ষদত্ত ক্রোধ-কম্পিতদেহে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন, হরিসাধুর সঙ্গে নীলাম্বর দাসের শ্যালক রামরায়ের হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। তখন বিবাদ থামাইবার উদ্দেশে

চণ্ডীপ্রসাদ সদাগর কহিলেন, "বেহুলাকে তিন প্রকার পরীক্ষা করা হউক।"

(১) জতুগৃহে তাহাকে রাখিয়া অগ্নিতে সেই গৃহ দাহ করা যা'ক্। দ্বাপরে শ্রীরাম-চন্দ্র-মহিষী এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(২) বেহুলাকে শূলে চড়াইয়া পরীক্ষা করা হউক, কলিতে ময়না-নিবাসী কর্ণসেনের পত্নী রঞ্জাবতী পুত্রার্থ এইরূপ পরীক্ষায় স্বয়ং ব্রতী হইয়াছিলেন।

(৩) কালভুজঙ্গদংশনে বেহুলা রক্ষা পাইলে তাহার সতীত্ব প্রমাণিত হইবে, উজানী-নগরবাসী ধনপতি সদাগরের স্ত্রী খুল্লনা এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

বেহুলা যদি সতী হন্, তবে এই তিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহা প্রমাণিত হইবে এবং তাহাকে গৃহে রাখা যাইবে। নীলাম্বর দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন

করিলেন এবং চাঁদ সদাগরকে সম্মতি দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে চেষ্টা পাইলেন। সদাগর লজ্জায় ও ঘৃণায় হেঁটমুখ হইয়া রহিলেন, জ্ঞাতিগণের বিরুদ্ধে সহসা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাঁহার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

অন্তঃপুর হইতে বেহুলা এই উত্তেজিত আলোচনার সংবাদ পাইয়াছিলেন; তিনি লজ্জাত্যাগ করিয়া সেই সভায় উপনীত হইলেন, তাঁহার পদার্পণে একটা পুণ্য-জ্যোতি সভাগৃহের উপর পতিত হইল। তিনি অবনতমস্তকে যুক্তকরে সকলকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমার পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা লাভ করিয়াছি, তদবধি আমার সাধ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন আপনারা আমাকে বর্জ্জন করিতে চাহিতেছেন, আমি নিজ হইতে

বিদায় লইতেছি,” এই বলিতে বলিতে বেহুলা সেই সভাগৃহে পড়িয়া গেলেন ; কি হইল কি হইল বলিয়া সকলে তথায় জড় হইয়া দেখিলেন – বেহুলার প্রাণ নাই ; অকস্মাৎ ঊৰ্দ্ধ হইতে একটা বিদ্যুৎপূর্ণ জ্যোতিঃশিখা সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিল, সকলে বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন সেই বিদ্যুৎ-মালায় অলঙ্কৃত হইয়া বেহুলা ও লক্ষীন্দ্র স্বর্গপথে বিলীন হইয়া যাইতেছেন। ইহারা ঊষা ও অনিরুদ্ধ, দেবসভায় কোন নবপ্রেম-বিহ্বলা, লজ্জাকুণ্ঠিতা অপ্সরার প্রেমকথা লইয়া রহস্য করাতে দেবরাজ ইহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ; অষ্টজন্মব্যাপক দুঃসহ বিরহ-ব্যথা সহ্য করিয়া এতদিন পরে ইহারা মুক্তি ও মিলনের বিমলানন্দ লাভ করিলেন।

পদ্মাপুরাণে উল্লিখিত আছে, মনসার বরে চাঁদসদাগর তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ

সহ দিব্যধামে গমন করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর মনসাদেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইতে আর কোন বাধা রহিল না।

—•—

(সমাপ্ত)